তৃতীয় মত এই যে, বৌদ্ধ-ধর্ম্ম সাংখ্যমতের পরিণাম। সাংখ্যমত বুদ্ধদেবের অনেক পূর্ব্ব হইতে চলিয়া আসিতেছিল, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। সাংখ্যমতে যেমন দর্শনসম্বন্ধীয় তত্ত্বগুলি গণিয়া সংখ্যা করিয়া রাখে, বুদ্ধমতেও তাই। সাংখ্যের অষ্টবিকৃতি, তিন প্রমাণ, পঞ্চভূত, একাদশ ইন্দ্রিয়, পঞ্চতন্মাত্র, অষ্টসিদ্ধি ইত্যাদি, বুদ্ধেরও সেইরূপ পঞ্চ স্কন্ধ, চতুরার্য্য সত্য, আর্য্য অষ্টাঙ্গমার্গ প্রভৃতি। সাংখ্যদর্শন যেমন ত্রিতাপনাশের জন্যই রচিত হইয়াছিল, বুদ্ধদর্শনও তেমনি ত্রিতাপনাশের জন্যই রচিত হইয়াছিল। সেই ত্রিতাপ নাশ করিতে গিয়া সাংখ্যগণ বলিয়াছিল, আত্মাকে কেবল, অর্থাৎ অন্য বস্তুর সহিত সম্পর্কশূন্য, করিয়া দিতে পারিলেই ত্রিতাপ নাশ হয়। বুদ্ধ বলিলেন, না, সে হইতেই পারে না, কারণ আত্মা থাকিলেই তাহা "কেবল" হইয়া থাকিতে পারে না, অতএব আত্মাই নাই বলিতে হইবে।

সাংখ্যমতের পরিণাম।

অনেকে মনে করেন, ব্রাহ্মণেরা সে সময়ে বড় অত্যাচারী হইয়া উঠিয়াছিলেন। তাঁহারা আপনাদিগকে ভূদেব বলিয়া মনে করিতেন। অন্য যে কেহই হউক না, তাঁহাকে ব্রাহ্মণের পদানত হইয়াই থাকিতে হইবে। বুদ্ধদেব এত অত্যাচার সহ্য করিতে পারিলেন না। তিনি আপামর সকলকেই মুক্তির উপদেশ দিতে লাগিলেন। ব্রাহ্মণের উপর তাঁহার দ্বেষই ধর্ম্মপ্রচারের কারণ। অনেক ইউরোপীয় পণ্ডিত একথা একবারেই স্বীকার করিতে চাহেন না। তাঁহারা বলেন, বৌদ্ধ-ধর্ম্ম ও ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মে কিছুমাত্র দ্বেষভাব ছিল না। কিন্তু সম্প্রতি চন্দ্রকীর্ত্তির টীকার সহিত আর্য্যদেবের চতুঃশতিকার কিয়দংশ ছাপা হইয়াছে, তাহাতে আচার্য্য সংঘসেন একজন বালকের সেবায় অত্যন্ত তুষ্ট হইয়া তাহাকে বৌদ্ধ-ধর্ম্মে দীক্ষা লইবার জন্য জিদ করিতে লাগিলেন। তখন সে বলিল, "আর কিছুদিন যাউক, আমি দীক্ষা লইব।" মাস খানেক পরে সে আসিয়া বলিল, "আচার্য্য, আমি

ব্রাহ্মণদের অত্যাচার ও প্রাধান্য দমনের জন্যই বৌদ্ধ-মত

এখন 'দীক্ষিত'।" আচার্য্য জিজ্ঞাসা করিলেন, "কিসে তোমার দীক্ষা হইল?" সে বলিল, "এখন ব্রাহ্মণ দেখিলেই আমার ইচ্ছা হয় যে আমি তাহাকে মারিয়া ফেলি, সুতরাং আমি বৌদ্ধ-ধর্ম্মে দীক্ষিত।"

আবার একদল আছেন তাঁহারা বলেন, বুদ্ধদেব শাক্যবংশে জন্মিয়াছিলেন। শাক্য শব্দ শক শব্দ হইতে উৎপন্ন। সুতরাং তিনিও শক ছিলেন। শকেদেরই ধর্ম্ম তিনি প্রচার করেন। শকেরা কোনও কালে হিমালয়ের উচ্চ শিখর উত্তীর্ণ হইয়া কপিলবাস্তুতে বাস করিয়াছিল, তাহারা স্বগোত্রে বিবাহ করিত, সুতরাং তাহারা কিছুতেই আর্য্য হইতে পারে না। অনেক শকজাতীয় রাজারাও আপনাদিগকে শাক্যবংশের লোক বলিয়া পরিচয় দিতেন এবং বুদ্ধদেবের জ্ঞাতি বলিয়া গৌরব করিতেন।

বুদ্ধদেব শকজাতীয়, তাহার ধর্ম্ম শকজাতীয় ধর্ম্ম।

কোন কোন ইউরোপীয় পণ্ডিত মনে করেন যে, বুদ্ধদেবের গল্পটি সত্য নহে। উহা ইতিহাস নহে, উহা সূর্য্যসম্বন্ধীয় একটি প্রাচীন কল্পিত আখ্যায়িকা মাত্র। শাল গাছে ভর করিয়া মা দাড়াইলেন ও মায়ের দক্ষিণ কুক্ষি ভেদ করিয়া বুদ্ধদেব জন্মাইলেন, ইহা পূর্ব্বদিকে সূর্য্য উদয় ভিন্ন আর কিছুই নহে। আবার দুইটি শালগাছের মাঝখানে গালে হাত দিয়া বুদ্ধদেব নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইলেন, ইহাও সূর্য্যের অস্তগমন ভিন্ন আর কিছুই নহে। যাহারা এই আখ্যায়িকা সাজাইয়াছেন, তাঁহাদের সুবুদ্ধিরচনায় বাহাদুরী খুব আছে।

সূর্য্যদেবের গল্প।

যাঁহারা ভারতবর্ষের যাহা কিছু সবই গ্রীকদিগের কাছ হইতে লওয়া মনে করেন, তাঁহারাও বুদ্ধদেব গ্রীকদিগের কাছ হইতে কিছু লইয়াছেন, একথা বলিতে পারেন না। কেননা যখন তাঁহার জন্ম হয়, অথবা যখন তাঁহার মৃত্যু হয়, তখন পর্য্যন্ত গ্রীকজাতি ভারতবর্ষের দিকে কেহ আসেনই নাই। কিন্তু ভারতবর্ষের নিজস্ব কিছু থাকিতে পারে,

জেরোয়াষ্টারের গল্প।

একথা তাঁহারা স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহেন। তাঁহারা বলেন, বুদ্ধদেব ও মার আর কেহই নহে, জোরোয়াষ্টারের মতের অহুরমজদা ও আহরিমান মাত্র। জোরোয়াষ্টারের মতে যেমন ভাল ও মন্দের লড়াইয়ে শেষ ভালরই জয় হইল, মন্দ হারিয়া গেল, এমতেও তেমনি বুদ্ধ জিতিলেন ও মার হারিয়া গেলেন। জিহোবা ও সয়তান যদি ভাল ও মন্দের লড়াই হয়, তবে বুদ্ধ ও মার না হইবেন কেন?

থাড়ু জাতির ধর্ম্ম।

যেখানে প্রায় ২৫০০ বৎসর পূর্ব্বে বুদ্ধদেবের জন্ম হয়, এখন সেইখানে থাড়ু নামে এক জাতি বাস করে। উহারা বিশেষ সভ্য নহে। পূর্ব্বে উহাদিগকে চেরো বলিত এখন থেড়ো হইয়া গিয়াছে। ছোটনাগপুরের অনেক অসভ্যজাতিই বলেন যে তাহারা চেরোদের সন্তান, রোটাসগড়ের দিক হইতে অথবা তাহারও উত্তর হইতে তাহারা ছোটনাগপুরে আসিয়াছে। অতি প্রাচীনকালে বঙ্গ বগধ ও চের নামে তিন জাতি আর্য্যদিগের শত্রু ছিল। উহাদের মধ্যে চেররাই এখনকার থেড়ো, উহাদের ধর্ম্মই বুদ্ধদেব সংস্কার করিয়া উত্তর ভারতের অনেক সুসভ্য দেশে প্রচার করেন। এও একটা মত আছে।

বুদ্ধদেব আর্য্য কি না।

এই সকল মতের প্রতিবাদ করা আমার উদ্দেশ্য নহে। কেবল কত রকমের ভিন্ন ভিন্ন মত আছে তাহা দেখানই আমার উদ্দেশ্য। কিন্তু এবিষয়ে বিচার করিতে গেলে প্রথম দেখিতে হইবে বুদ্ধদেব আর্য্য কি না। তিনি যে আর্য্য নন একথা বলিবে কিরূপে? তিনি ইক্ষ্বাকুবংশে জন্মান। ইক্ষ্বাকুবংশ বেদেও প্রসিদ্ধ। তাঁহারও গোত্র আছে, গোতম গোত্রের কপিলমুনি শাক্যবংশের আদিগুরু। গোতমের নাম হইতেই শাক্যসিংহকে গৌতম বলিয়া ডাকা হয়। তখন গুরুর গোত্র লইয়া ব্রাহ্মণ ভিন্ন আর্য্যজাতির গোত্র হইত, প্রমাণ অশ্বঘোষের উক্তি :—

একপিত্রোর্যথাভ্রাত্রোঃ পৃথক্ গুরুপরিগ্রহাৎ
রামএবাভবৎ গার্গো বাসুভদ্রোপি গৌতমঃ ॥

এক বাপের দুই ছেলে; রাম ও বাসুভদ্র। পৃথক্ পৃথক্ গুরু স্বীকার করায় রাম হইলেন গার্গ্য এবং বাসুভদ্র হইলেন গৌতম। সুতরাং বুদ্ধদেবের পূর্ব্বপুরুষগণ অন্য জাতীয় লোক হইয়া গুরুর গোত্র গ্রহণ করিয়া গৌতম হওয়া বিচিত্র নহে। শাক্যগণ ইক্ষ্বাকু বলিয়া গর্ব্ব করিতেন। কিন্তু এটা ত ঠিক তাঁহাদিগকে ইক্ষ্বাকুরাজ্য হইতে তাড়াইয়া দেওয়া হয় এবং বৈমাত্র ভাইয়ের উপকারের জন্যই তাড়ান হয়। পাটরাণীর ছেলেকে ত তাড়ান শক্ত, সুতরাং তাঁহারা অন্য রাণীর ছেলেই হইবেন। রাজারা তখন অনেক বিবাহ করিতেন এবং বিবাহে জাতিবিচার বড় একটা করিতেন না। সুতরাং ভরত-বংশ যেমন পাকা আর্য্য, শাক্য যে তেমন পাকা এরূপ বোধ হয় না। আর্য্যাবর্ত্তও সে সময়ে যে উভয় সমুদ্র পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল তাহাও বোধ হয় না। আর্য্য ও বঙ্গবগধ জাতির সন্ধিস্থলে শাক্যবংশীয় রাজধানী ছিল। এইরূপ নানা কারণে শাক্যেরা যে পাকা আর্য্য ছিলেন, সে বিষয়ে যেন একটু সন্দেহ হয়।

তারপর যাগযজ্ঞে পশুহিংসা দেখিয়া বুদ্ধদেবের অহিংসা ধর্ম্মের উদ্রেক হয়, এটা ত বুদ্ধের কোনও জীবন-চরিতে বলে না। ললিত-বিস্তার বলে না, মহাবস্তু-অবদানে বলে না, বুদ্ধচরিতে বলে না। পালি গ্রন্থেও বলে না। তবে সেটার উপর বিশেষ ভরও দেওয়া যায় না। ঐটাই যদি প্রধান কারণ হইত, তাহা হইলে তাঁহার এত জীবনী, একখানি না একখানিতে একথাটা থাকিত যে বুদ্ধ পশুহত্যা দেখিলেন, তিনি করুণায় গলিয়া গেলেন ও যাহাতে পশুহত্যা নিবারণ হয়, তাহারই জন্য ধর্ম্ম-প্রচার করিতে বসিলেন। অহিংসা যে পরম ধর্ম্ম, তাঁহার পূর্ব্বেও লোকে জানিত। যাঁহারা সৌভাগ্যক্রমে বৃদ্ধ বয়স পর্য্যন্ত পঁহুছিতেন ও ভিক্ষু-আশ্রম গ্রহণ করিতেন, তাঁহারা ত হিংসা করিতেন না। জৈনেরা বুদ্ধদেবের বহুপূর্ব্ব হইতে অহিংসাধর্ম্ম পালন করিয়া আসিতেছিল। অতএব ওকথাটা ঠিক বলিয়া বোধ হয় না।

উপনিষদের অদ্বৈতবাদ হইতে বুদ্ধদেবের ধর্ম্মের উৎপত্তি, একথা

স্বীকার করা কঠিন। কারণ উপনিষদ্, বিশেষ তাহার অদ্বৈতবাদ, বুদ্ধদেবের সময়ে হইয়াছিল কি? ব্রাহ্মণগুলি যজ্ঞ করিবার জন্য লেখা হয়। প্রাচীন উপনিষদ্গুলি, যথা ছান্দোগ্য, বৃহদারণ্যক, ব্রাহ্মণের অংশ, যজ্ঞেই উহার ব্যবহার হইত। যাজ্ঞিকেরা এখনও উহা যজ্ঞের অংশ বলিয়াই ব্যবহার করেন। শঙ্করাচার্য্যের মত ব্যাখ্যা তাঁহারা করেন না। সেকালে যে কোন সার কথা গুরুর কাছ হইতে শিখিতে হইত, তাহারই নাম উপনিষদ্ ছিল। অর্থশাস্ত্রের উপনিষদ ছিল, কামশাস্ত্রের উপনিষদ্ ছিল। বৌদ্ধেরাও উপনিষদ্ শব্দ বেশ ব্যবহার করিয়া গিয়াছেন।

মোক্ষস্যোপনিষৎ সৌম্য বৈরাগ্যমিতিগৃহ্যতাম্।
বৈরাগ্যস্যাপি সংবেগঃ সংবিদো জ্ঞানদর্শনম্॥
জ্ঞানস্যোপনিষচ্চৈব সমাধিরুপধার্য্যতাম্।
সমাধেরপ্যুপনিষৎ সুখং শারীরমানসম্॥
প্রশ্রব্ধিঃ কায়মনসোঃ সুখোস্যোপনিষৎ পরা।
প্রশ্রব্ধেরপ্যুপনিষৎ প্রীতিরপ্যবগম্যতাম্॥
তথা প্রীতেরুপনিষৎ প্রামোদ্যং পরমং মতম্।
প্রামোদ্যস্যাপ্যহৃল্লেখঃ কুকৃতেষ্বকৃতেষু চ॥
অবিলেখস্য মনসঃ শীলন্তূপানিষচ্ছুচি।

মোক্ষের মূল বৈরাগ্য; বৈরাগ্যের মূল আগ্রহ; আগ্রহের মূল জ্ঞানদর্শন; জ্ঞানের মূল সমাধি; সমাধির মূল শরীর ও মনের সুখ; সুখের মূল শরীর ও মনের শান্তি; শান্তির মূল প্রীতি; প্রীতির মূল স্ফূর্ত্তি; স্ফূর্ত্তির মূল কুকার্য্য করিয়া অথবা কর্ত্তব্য কর্ম্ম . করিয়া হৃদয়ে ব্যথা না থাকা। ব্যথা না থাকার মূল বিশুদ্ধ শীল।

আর উপনিষৎ বলিয়া একটি দর্শনের মত আমরা সর্ব্ব প্রথম হর্ষচরিতে দেখিতে পাই। হর্ষচরিতে হর্ষ যখন দিবাকরের আশ্রমে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, তখন তথায় নানা সম্প্রদায়ের ছাত্র পাঠ

করিতেছে দেখিতে পাইলেন ; তাহার এক সম্প্রদায় ঔপনিষদ। কালিদাসও তাঁহার বিক্রমোর্ব্বশীতে বলিয়াছেন, "বেদান্তেষু যমাহুরেক পুরুষম্"—এখানেও বেদান্ত শব্দের অর্থ উপনিষৎ। সুতরাং কালিদাস ও হর্ষরাজার সময়েই উপনিষদ্ একটা দার্শনিক মতের মধ্যে গণ্য হইয়াছিল, কিন্তু সে ত বুদ্ধের বহুকাল পরে। উপনিষদের যে এত প্রাদুর্ভাব এখন দেখা যাইতেছে, ইহা ত শঙ্করাচার্য্যের পর হইতেই হইয়াছে। তাই বলিতেছিলাম, উপনিষদের অদ্বৈতবাদ হইতে বৌদ্ধ-ধর্ম্ম, এটা বিশ্বাস করা কঠিন। আরও কথা, বৌদ্ধ-ধর্ম্মটাই কি গোড়ায় অদ্বৈতবাদ ছিল ? সেটা মহাযানীরাই না ফুটাইয়া তুলিয়াছে ?

শকজাতি হইতে শাক্যজাতির উদ্ভব, এ কথাটাও ঠিক বলিয়া বোধ হয় না। কারণ শকেরা ত শুঙ্গরাজাদের সময় খৃঃ পূঃ দ্বিতীয় শতে ভারতবর্ষে আসে। তাহাও আবার সুদূর পশ্চিমে পাঞ্জাবের কোলে। হিমালয় অতিক্রম করিয়া শকেদের আসা কোথাও দেখা যায় না। ইহাতে কেহ কেহ বলিতে পারেন, ভারবর্ষের ইতিহাসই নাই, তবে কোন কথা শুনা যায় নাই বলিয়া তাহা একেবারে মিথ্যা, এরূপ জোর করিয়া বলা যাইবে কিরূপে ? কিন্তু আমরা শাক্য শব্দের আর এক প্রকার ব্যুৎপত্তি পাইয়াছি। তাহাতে সকল কথার সামঞ্জস্য রক্ষা হয়। অশ্বঘোষ বলিয়াছেন, শাক নামে এক রকম গাছ আছে। সেই গাছে ঘেরা জায়গায় বাস করেন বলিয়া বুদ্ধদেবের পূর্ব্বপুরুষদের শাক্য বলিত। এ কথাটা বেশ সঙ্গত বলিয়া বোধ হয়। নেপালের তরায়ে এখনও শকিয়া শালের গাছই অধিক। শাক গাছ শকিয়া [illegible]. শাক্য শব্দের ব্যুৎপত্তির জন্য হিমালয় ও তিব্বত পার হইয়া শকজাতির দেশে যাইবার প্রয়োজন নাই।

বৌদ্ধ-ধর্ম্ম সাংখ্যমত হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, একথা অশ্বঘোষ এক প্রকার বলিয়াই গিয়াছেন। বুদ্ধদেবের গুরু আডার কলম ও উদ্রক দু'জনেই সাংখ্যমতাবলম্বীছিলেন। দু'জনেই বলিয়াছিলেন, 'কেবল' অর্থাৎ জগতের সহিত সম্পর্কশূন্য হইতে পারিলেই মুক্তি হয়। বুদ্ধ

তাঁহাদের মত না মানিয়া বলিয়াছিলেন, "কেবল" হইলেও অস্তিত্ব ত রহিল ; অস্তিত্ব রহিলে নিঃসম্পর্ক হইবার জো নাই। এ কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি।

যদি বৌদ্ধ-ধর্ম্ম সাংখ্য হইতেই উৎপন্ন হয়, তবে ত উহা আর্য্য-ধর্ম্ম হইতেই উৎপন্ন হইল। আমার সেই কথাতেই সন্দেহ। সাংখ্যমত কি বৈদিক আর্য্যগণের মত ? শঙ্করাচার্য্য ত উহাকে বৌদ্ধাদি মতের ন্যায় অবৈদিক বলিয়াই উল্লেখ করিয়াছেন। তবে তিনি এত যত্ন করিয়া ও মত খণ্ডন করেন কেন ? মন্বাদিভিঃ কৈশ্চিৎ শিষ্টৈঃ পরিগৃহীতত্বাৎ। মনু প্রভৃতি কয়েকজন শিষ্ট উহাকে গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া। সাংখ্যমত কপিলের মত চিরকাল প্রবাদ। কপিলের বাড়ী পূর্ব্বাঞ্চলে অর্থাৎ বঙ্গবগধচেরদিগের দেশে। গঙ্গাসাগর যাইতে কপিল-আশ্রম আছে, কবতক্ষের ধারে কপিল মুনির গ্রাম। কপিলবাস্তুও কপিল মুনির বাস্তু। কারণ অশ্বঘোষ বলিতেছেন, গোতমঃ কপিলো নাম মুনির্ধর্ম্মভৃতাং বয়ঃ। তাঁহারই বাস্তুতে কপিলবাস্তু নগর। বাস্তবিকও কপিলকে কেহ ঋষি বলে না। তাঁহার নাম করিতে গেলেই বলে আদিবিদ্বান্। বাল্মীকি যেমন আদি কবি, তিনিও তেমনি আদিবিদ্বান্। শ্বেতাশ্বতরে তাঁহাকে "পরমর্ষি" বলা হইয়াছে। কিন্তু ভাব ভাষা ও মত দেখিলে এখানিকে নিতান্ত অল্পদিনের পুস্তক বলিয়া বোধ হয়।

কৌটিল্য তিনটি মাত্র দর্শনের অস্তিত্ব স্বীকার করেন, সাংখ্য, যোগ ও লোকায়ত ; কৌটিল্য ২৩০০ বৎসর পূর্ব্বের লোক। তাঁহার সময় অন্য দর্শন হয়ই নাই, হইলে তাঁহার মত সার্ব্বভৌম পণ্ডিতের তাহা অবিদিত থাকিত না। সেই তিনটির মধ্যে লোকায়ত মত, লোকে আয়ত অর্থাৎ ছড়াইয়া পড়িয়াছে বলিয়া ঐ নাম পাইয়াছে, উহার আদি নাই, ও মত সর্ব্বত্র সকলেরই মত। খাও দাও সুখে থাক—এমত আবার কে প্রচার করিতে যাইবে ? সকলেই জানে, সকলেই বুঝে ও সকলেই সেই মতে কার্য্য করে সুতরাং উহার

কথা ছাড়িয়া দিলে আমাদের বিশেষ ক্ষতি নাই। যোগমত সাংখ্য-দর্শনেরই রূপান্তর মাত্র। দুইই দ্বৈতবাদী।

সাংখ্য ও যোগের যে সকল পুস্তক আছে সকলগুলিই নূতন। ঈশ্বরকৃষ্ণের কারিকাই তাহাদের মধ্যে পুরাণ। ঈশ্বরকৃষ্ণ খৃষ্টীয় পাঁচ শতের লোক। কিন্তু তাঁহার পূর্ব্বেও সাংখ্যমতের পুস্তক ছিল; মাঠর ভাষ্যের কথা অনেক জায়গায় শুনিতে পাওয়া যায়। পঞ্চ-শিখের দু'চারিটি বচন যোগভাষ্যকার ধরিয়াছেন। আসুরির একটি কবিতা একজন জৈনটীকাকার তুলিয়াছেন। মহাভারতে আসুরির নাম নাই, পঞ্চশিখের নাম আছে। তিনি জনক রাজার সভায় মিথিলায় উপস্থিত ছিলেন। কপিলের নিজের কোন বচন এপর্য্যন্ত পাওয়া যায় নাই। যে ২২টি সূত্র কপিলসূত্র বলিয়া চলিতেছে, তাহাও বিশেষ প্রাচীন নহে, ঈশ্বরকৃষ্ণের কারিকা দেখিয়া লেখা বোধ হয়। কিন্তু অশ্বঘোষের লেখা ও কৌটিল্যের উক্তি দেখিয়া সাংখ্য যে খুব প্রাচীন তাহা বেশ অনুভব হয়।

সংহিতায় ও ব্রাহ্মণে আদিবিদ্বান্ কপিলের নামও নাই গন্ধও নাই। আমাদের এখনকার ব্যবহারেও সাংখ্যমতের বড় বড় লোক-গুলি মানুষ। ঋষিও নন মুনিও নন। আমরা যে নিত্যতর্পণ করিয়া থাকি তাহাতে—

সনকশ্চ সনন্দশ্চ তৃতীয়শ্চ সনাতনঃ
কপিলশ্চাসুরিশ্চৈব বোঢুঃ পঞ্চশিখস্তথা।

বলিয়া যাহাদের তর্পণ করি, রঘুনন্দন বলেন তাঁহারা মনুষ্য। এই কবিতায় যাঁহাদের নাম আছে, তাঁহারা সকলেই সাংখ্যমতের প্রতিষ্ঠাতা ও আচার্য্য।

উপরের লেখা হইতে তিনটি কথা বুঝা যায়, যে সাংখ্যমত সকলের চেয়ে পুরাণ, উহা মানুষের করা এবং পূর্ব্ব দেশের মানু-ষের করা। উহা বৈদিক আর্য্যদের মত নহে, বঙ্গ বগধ বা চেরজাতির কোন আদিবিদ্বানের মত। যাঁহারা পুত্র পশু প্রভৃতি

লাভের জন্য, পুষ্টি তুষ্টির জন্য বড় জোর স্বর্গকামনায়, যাগযজ্ঞ করিতেন, তাঁহাদের মধ্যে ত্রিতাপনাশের জন্য "আমি প্রকৃতি হইতে ভিন্ন নির্লেপ নির্ব্বিকার" ইত্যাদি মত উদ্ভব হওয়া কঠিন। ইহা অনায়াসেই মনে হইতে পারে যে এই মত অন্যত্র উদ্ভূত হইয়া ক্রমে কোন কোন আর্য্য পণ্ডিত কর্ত্তৃক পরিগৃহীত হওয়ায় আর্য্যগণের মধ্যে চলিয়া গিয়াছে। হেমাদ্রি বেশীদিনের লোক নহেন, তাঁহার সময় খৃষ্টীয় ৩ের শতে, তিনি বলিতেছেন যে, যে ব্রাহ্মণ সাংখ্য মত ভাল জানেন, তিনি বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণের ন্যায় পংক্তি-পাবন, কিন্তু যে ব্রাহ্মণ কাপিল সে পংক্তিবাহ্য। ইহাতেও অনুমান হয়, কপিলের কোন কোন সম্প্রদায়ের মত ব্রাহ্মণগণ আদরের সহিত গ্রহণ করিয়াছিলেন। আর কোন কোন সম্প্রদায়ের মত একেবারেই গ্রহণ করেন নাই।

যদি সাংখ্য হইতেই বুদ্ধমতের উৎপত্তি হয়, তাহা হইলে বৈদিক আর্য্যমত হইতে উহার উৎপত্তি বলা যাইতে পারে না। বৌদ্ধধর্ম্মে আরও অনেক জিনিষ আছে যাহা আর্য্যধর্ম্মের খুব বিরোধী। আর্য্যগণ তিন আশ্রম পালন না করিয়া ভিক্ষু আশ্রম গ্রহণ করিতেন না। আপস্তম্ব প্রভৃতি সকল সূত্রকারেরই মত এই যে, ব্রহ্মচারী হইয়া গৃহস্থ, তাহার পর বানপ্রস্থ ও তাহার পর ভিক্ষু হইবে। কিন্তু বুদ্ধ উপদেশ দিতেন যে যখনই সংসারে বিরাগ উপস্থিত হইবে, তখনই সংসার ত্যাগ করিয়া ভিক্ষু হইতে পারিবে। এমন কি অতি শিশুকেও ভিক্ষু করিতে তিনি কুণ্ঠিত হইতেন না। কয়েকটী নাবালগকে ভিক্ষু করায় কপিলবাস্তুতে বড় গোলমাল উপস্থিত হয়। তাহাতে বুদ্ধদেবের পিতা বুদ্ধকে বুঝাইয়া বন্দোবস্ত করিয়া দেন যে, নাবালগকে শিষ্য করিতে হইলে তাহার পিতামাতার অনুমতি লইতে হইবে। ক্রমে বৌদ্ধ কর্ম্মবাচায় দেখিতে পাওয়া যায়, একুশ বৎসরের পূর্ব্বে কাহাকেও দীক্ষা দেওয়া হইত না। যে কেহ দীক্ষা লইতে আসিত, তাহাকেই জিজ্ঞাসা করা

আশ্রম পালন

হইত, তোমার বয়স একুশ বৎসর হইয়াছে ত? বহুকাল পরে শঙ্করাচার্য্য এই মত প্রকাশ করেন যে, 'যদহরেব বিরজ্যেৎ তদহরেব প্রব্রজেৎ'। এটি জাবালোপনিষদের বচন। সম্ভবতঃ শঙ্করাচার্য্যের পূর্ব্বেই এই উপনিষদ্ রচিত হইয়াছিল। উহা কোন ব্রাহ্মণের অন্তর্ভুক্ত নহে, সুতরাং বুদ্ধদেবের পূর্ব্ববর্ত্তী হওয়া সম্ভব নহে।

বৌদ্ধভিক্ষুর বেশ হইতেও দেখা যায় উহা আর্য্যবিরোধী বেশ। আর্য্যগণ উষ্ণীষ ও উপানহ ভিন্ন চলিতেন না। মাথায় পাগড়ী ও পায়ে জুতা সবারই থাকিত। কিন্তু বৌদ্ধগণ বাঙ্গালীর মত খালিমাথায় থাকিতেন এবং উপানহ ব্যবহার করিতেন না।

বেশ

এই সকল নানা কারণে বোধ হয় যে, পূর্ব্বাঞ্চলে বঙ্গ বগধ ও চের নামে যে তিনটী সভ্য জাতি বাস করিতেন, তাহাদের সঙ্গে আর্য্যগণের মেলামেশায় বৌদ্ধধর্ম্মের উৎপত্তি হইয়াছে। যে জায়গায় আর্য্যগণের পশ্চিমসীমা ও ঐ জাতিসকলের পূর্ব্বসীমা, সেইখানেই বৌদ্ধধর্ম্মের উৎপত্তি। উহা পূর্ব্বাঞ্চলে অতিশয় প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল, পশ্চিমাঞ্চলে উহার প্রাদুর্ভাব কখনই এত অধিক হয় নাই। পাঞ্চাল, কুরুক্ষেত্র ও মৎস্যদেশে যে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রবল ছিল, ইহার প্রমাণ বড় একটা পাওয়া যায় না।

শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী।

আমার কথা

শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ এই পাঁচ পদার্থকে আমি আগে চিনতে পারি নাই। এদের রকম-সকম আমি বুঝতে পারতাম না। অথচ একটা দেহের মধ্যে এদের পাঁচজনাকে নিয়েই জন্ম লয়েছিলাম। জন্মাবধি এরা আমার চিরসঙ্গীই হয়ে আছে। এতকাল এক সঙ্গে থাকলে যে জানাটুকু হয়, এদের নিয়ে এতদিন আমার তা হয় নি, কখনও যে হবে তাও মনে করি নাই। আমার সঙ্গে এসে এরা এই দুগ্ধপোষ্য শিশুকে নিয়ে, কি করেছিল না করেছিল তার খবর আমি রাখি না। আমি একটা কলের পুঁতুলের মত শোওয়া থেকে বসা, বসা থেকে দাঁড়ান এবং দাঁড়ান থেকে চলন শিখলাম। একজন, কে, যে এই বেগার খাটতেন, তা বুঝবার মত বুঝ তখনও আমার হয় নাই। এরা পাঁচজনে মিলে তখন যেমন আমার উপর আধিপত্য করত, তেমন আবার অসহায় শিশু ব'লে করুণাও জানাত। এদের ছাড়িয়ে আমার যাবার জায়গা ছিল না। সে সময় এদের কাজ ছিল মিলেমিশে আমাকে গড়ে তোলা। শব্দ আমাকে দিয়ে "মা" ডাকিয়ে আরাম পেত, পরশ আমাকে একটা মায়ের বুকে রাখিয়ে ঘুম পাড়াত। চোখের সাম্নে একটা মাতৃরূপ দেখে আমি মাতোয়ারা হয়ে যেতাম। সে মা আমাকে হাতে করে যা মুখে তুলে দিতেন তাই আমার বড় মিষ্টি লাগত। আমি সেই লোভে এতই মায়ের বশ হয়েছিলাম যে তার আঁচল ছাড়তাম না। আমার মায়ের গায়ের সুগন্ধে আমার সর্ব্বাঙ্গ আমোদিত হ'ত। আমি তখন বেল, যুঁই, গোলাপ, চামেলী ছিঁড়েখুঁড়ে দূর করে ফেলে দিতাম। তাদের গন্ধ কটু লাগত। এ রকমে সুখে আমার শিশু কালটা কেটে গেল, আমি শৈশবে এসে পৌঁছিলাম। তখন আর কেবল মা-জগতে বাঁধা পড়ে

থাক্‌তে পার্‌লামনা। মেলা বাজে লোক এসে, আমাকে খেলার লোভ দেখিয়ে, একরকম জোর করে আমার মায়ের আঁচলের বেড়া ভেঙ্গে দিয়ে, আমাকে হাত ধরে টেনে বাইরে লয়ে গেল। প্রথম প্রথম কাঁদ্‌তাম, মাকে ছেড়ে থাকতে পার্‌তাম না। শেষে মা যখন বুঝিয়ে বল্লেন, তখন একেবারে এদের সঙ্গে খেলায় মেতে গেলাম। সঙ্গীদের ডাক তখন বেশ লাগ্‌ত, তারা যখন হাত ধরে টেনে নিয়ে যেত, তখন আর মায়ের মুখ মনে পড়্‌ত না, তাদের মুখপানে চেয়ে মাকে ভুলে যেতাম। মায়ের দেওয়া ছাড়াও অনেক জিনিস মিষ্টি লাগ্‌ত, ফুলের গন্ধে তখন বিরক্ত হ'তাম না। এইভাবে একটু একটু করে এই পাঁচভূতে মিলে, আমাকে এক রকম মা ছাড়া করে দিল। দিয়ে, আমার সাম্নে একটা ছোট্ট "আমিকে" এনে খাড়া করল। আমি না জেনে শুনে তার বশ হয়ে পড়্‌লাম। সে হোল এখন আমার হর্ত্তা, কর্ত্তা, বিধাতা। সে যা করায়, আমি তাই করি, আছি মন্দ না। কিন্তু কতদিন পরে দেখি, কে এসে, এই আমার শৈশবের সঙ্গে চুপে চুপে নিত্যই কথা বলে। একদিন কান পেতে শুনি, সে বল্‌ছে "আর কেন ভাই! এবারে সরে পড়, আমায় আস্‌তে দেও, অম্‌নিতে না দেও জোর করে আস্‌ব।" মহা তম্বি। আমি ত ভয়ে মরি! কে আবার আস্‌বে! এসে না জানি কি কর্‌বে। এ দেহটার মধ্যে কটাকেই বা জায়গা দিব! শেষকালে এরা ঝগড়া বাঁধালে মারা যাব যে! তা দুইজনে দেখি ভাবসাব করে কিছুদিন গল্পেসল্পেই কাটিয়ে দিলে। কিন্তু কচি শৈশব কৈশোরের চালা-কির সঙ্গে পেরে উঠ্‌বে কেন! সে কথার অছিলায় এসে দেহটাকে দখল কর্‌বার চেষ্টায় রইল। বলে,—এইটুকু পুরীতে থাক কেমন করে, আমার কেমন হাঁপ ধরে। আমি একে কেটে ছেঁটে ছেনে বিনে দেখ না কেমন নূতন করে গড়ে তুলি। আর দেখ, তা না করে আমি পারি না। আমি যার আদেশ পালন কর্‌তে এসেছি, তার এসব কোন মতেই পছন্দসই হবে না। আমাকে তাই তিনি

অগ্রদূত পাঠিয়ে দিয়েছেন সব ঠিক ঠাক কর্তে। তিনিও যে এখানে আস্বেন এবং এসে কিছুদিন থাক্বেন। আমার পঞ্চেন্দ্রিয় কৈশোরকে পেয়ে একেবারে এর দাসানুদাস হয়ে পড়েছে। ও যা বল্‌ছে, ওরা তৎক্ষণাৎ তা কর্‌ছে। শৈশব বেচারী নিরুপায় দেখে আস্তে আস্তে একেবারে চম্পট দিল। তখন ওরা মুখ চাওয়া-চায়ি করে খুব হাস্‌ল। কৈশোরের আমার আগেকার কিছুই মনাসিপ্‌ নয়। আমার দেহটাকে নিয়ে একটা লণ্ডভণ্ড কাণ্ড উপস্থিত কর্‌ল। দেহের মধ্যে আছি বটে কিন্তু এরা কিছুতেই আমাকে আমল দিচ্ছে না। আমি কেবল বসে বসে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে দেখ্‌ছি আর ভয়ে কাঁপ্‌ছি। ওমা! একদিন হঠাৎ পায়ে চল্‌তে গিয়ে দেখি পা দুটো জড়িয়ে জড়িয়ে আস্‌ছে, কিছুতেই সোজা হয়ে এগুতে পার্‌ছিনা। কি হবে, কোথায় গেল আমার সেই চঞ্চল অবাধ গতি। খুঁজ্‌তে খুঁজ্‌তে দেখি কিনা সে আমার চখের চাহনিতে গিয়ে বসে আছে, আর সেখানকার সরলতাটুকু পক্ষ্ম-পংক্তি চুরী করেছে! দেখে হাসিও পেল, ফের কান্নাও আস্‌ল। আমার হাত পা সবেরই গড়ন বদ্‌লে গেছে, বক্ষের ভারে আমার দেহ আনত হয়ে পড়েছে, কিন্তু তাতে দৃষ্টি কটু হয় নাই। কৈশোর কিন্তু কারিগর ভাল, বল্‌তে লজ্জা করে! সবই বড় সুন্দর হোল। এত সুন্দর যে পাছে কারো নজর লাগে বলে, বক্ষ ক্রমাগত আমায় শাসাচ্ছে "ঢাক ঢাক", গলার স্বর বল্‌ছে "চাপ চাপ", আর চোখের চাহনি ইসারা কর্‌ছে, "রোখ, রোখ"—আমি যে কি কর্‌তে কি করি ভেবে ভেবাচেকা খেয়ে গেছি। আমার যে আঁচল মাটিতেই লুটপুটি খেত, সাবধানে তাকে তুলে ধ'রে অঙ্গের আবরণ কর্‌লাম। কৈশোর তখন আমায় অমন জড়সড় দেখে হেসে বল্লে, "ভীরু! কেন ভয় পাচ্ছ? যে তোমার ঘরে আস্‌বে বলে এত আয়োজন, সে যে মাতৃত্বের আগমনী। তাকে ভয় কিসের? যে মাকে পেয়ে তুমি বেঁচে গিয়েছিলে, তোমায় আবার সে মা সাজ্‌তে হবে জান?" একথা শুনে আমার আরো ভয়

বাড়্‌ল, বুকটা ধড়্‌ফড়্‌ করে উঠ্‌ল, দুই হাতে চেপে ধ'রে রাখি তবু মানে না। ভয়ে ত্রাসে শঙ্কায় আমার যেন কথা বন্ধ হয়ে এল, কারোকে মুখ দেখাতে ইচ্ছা করেনা, কেমন কুণো হয়ে পড়্‌লাম। এভাবে আছি এমন সময় আচম্বিতে ধীর পদবিক্ষেপে, কে আমার নূতন ঘরে প্রবেশ কর্‌ল, যেন কৈশোরের কাজ তদারক কর্‌বার জন্য। কিন্তু কৈশোরের কাজ নিপুণ হাতের কাজ, খুঁৎ ধর্‌বার যো নেই। তবে এখনও অসমাপ্ত, সময় পায় নাই শেষ কর্‌বার। যৌবন শক্তি-শালী, শেষ কর্‌বার ভার সে নিজের হাতে নিল। সঙ্গে অনেক সরঞ্জাম এনেছিল, চট্‌পট্‌ কাজ এগুতে লাগ্‌ল। সর্ব্বশেষে তার ভাণ্ডার থেকে লাবণ্যের ভাণ্ড এনে সবটা আমার গায়ে মাখিয়ে দিল। আমি আর আমাকে চিন্‌তে পার্‌ছি না। আমার আপন দেহের কমনীয় কান্তি দেখে গর্ব্ব কর্‌তে ইচ্ছে হচ্ছে। আমার 'আমি' তখন একজন হয়ে উঠ্‌ল। সে আর কারো তোয়াক্কা রাখে না। সে কেবল আমাকে কুপরামর্শ দিতে চায়। তাকে ছাড়া আর কারোকে মুরব্বি মান্‌তে নিষেধ করে। আমি মহা মুস্কিলেই পড়্‌লাম। যিনি আমার হিতাকাঙ্ক্ষী হয়ে এত কর্‌লেন, যার প্রসাদে এই দেহ-সম্পদ পেলাম, তাকে কি অবহেলা কর্‌তে পারি! অথচ এই 'আমি'র ভয়েও যে মরি! তাই ত যৌবন আমাদের ঘরে এসে আমাদের ভাবগতিক দেখে, দু'দিন যেতে না যেতেই, যাই যাই বুলি ছাড়ে, বেশীদিন তিষ্ঠিতে চায় না। তা না হবে কেন? এত খেটেখুটে, একটা নগণ্য দেহকে অমন করে তুল্‌লেন, আর তুমি কিনা তাকে গ্রাহ্যই কর্‌ছনা। তোমার ধারণা যে, এ তোমার চিরদিনের সম্পদ হোল? যাক্‌ না যৌবন যেতে চায় ত? এ তম্বুর তালিশ নিবে কে? নির্ব্বোধ জানে না এ যে স্বয়ং দেবতা, তার ক্ষমতা কি। আমার পাঁচ মাতব্বর তখন বেগ-তিক দেখে যৌবনের তোয়াজ কর্‌তে লেগে গেল। তখন কথায় কথায় লড়াই। এরা যা বলে তাতে 'আমি' কর্ণপাতও করে না, আবার 'আমি' যা বলে তাতে এদেরও ভ্রূক্ষেপ নাই। তোমরা—পুরুষেরা

একথা শুনে হাস্‌ছ জানি, কেননা একে তোমরা গায়ে বলবান, তাতে স্বভাবতঃ খোসামুদে, তোমাদের কথা আলাদা। এই দেখ না আমরা যতই এদের ভয়ে নুয়ে নুয়ে পড়ি, তোমরা ততই পায়ের উপর ভর দিয়া সিধা হয়ে দাঁড়াও। আমাদের চলন যত থেমে থেমে যায়, তোমরা তত দ্রুত চল। আমাদের গলার আওয়াজ যতই আড়ষ্ট হয়ে আসে, তোমরা তত গলা ছেড়ে কথা কও। আমরা হাসি চেপে যাই, তোমরা আরো প্রাণখুলে হাস। আমরা কারো দিকে চাইতে ভীত হই, আর তোমরা তখন ডাগর করে চাও। মোট কথা তোমরা পায়ে তেল দিয়ে কাজ হাঁসিল কর্‌তে জান, আমাদের তা আসে না। কি করেই বা আস্‌বে! চিরটা কাল আমাদিগকে অভিমানের উমেদারী করে কাটাতে হয়, এবং আমাদের উপর তার অনুশাসন রয়েছে—"বুক ফাট্‌বে ত কখনও মুখ ফোটাবে না, বিশেষতঃ এই খরতর যৌবনের জিম্বায় আছ যদ্দিন," কাজেই আমরা নাচার! যারা এই অভিমানের আধিপত্যকে শুধু আপনাদের স্বভাবের জোরে আমল না দিয়া পারে, তারা কি বুঝ্‌বে আমাদের বিড়ম্বনা। যাক্ সে কথা।

একদিন কিক্ষণে আমার "আমি"র মুহূর্ত্তের অন্তর্দ্ধানে, আমি আছি বসে আনমনে, এমন সময় আমার এই পঞ্চ প্রভু আমাকে একলা পেয়ে বল্‌ল, "কর্‌ছ কি? জান না যে এখনও তুমি শুধু তোমার আধখানা। এই তোমার অঙ্গের ভিতর দিয়েই তোমার অপরার্দ্ধকে খুঁজে নিতে হবে, তখন পূর্ণতা লাভ করে প্রেয়কে পেয়ে কৃতার্থ হবে।" আমি ভাব্‌লাম প্রেয় কি! তাকে কেমন করে পাওয়া যায়! প্রিয় ত অনেক আছে, কিন্তু তারা ত এতদিন কেউ আমাকে পূর্ণ কর্‌তে পারে নি। আমি আমার এই আধখানাকে নিয়ে অসম্পূর্ণ হয়ে আর কতদিন থাক্‌ব! এতদিন ত আমি জানি নাই, আমি তাই পূর্ণতাও খুঁজি নাই। যৌবনের এই কুসুম-শোভন লোভ-নীয় বিকাশকে নিয়ে কি কর্‌ব, কোথা যাব, তাই কেবল ভাব্-

ছিলাম। আজ আমার শব্দ, আমার স্পর্শ, আমার রূপ রস গন্ধ মিলে বল্‌ছে তারাই সেই অক্ষয় বস্তুকে মিলাবে। কিন্তু তাকে দূরে রেখে দেখলে চলবে না, শুধু তার বিগ্রহ নিয়ে খেলা কর্‌লে হবে না। সেই বিগ্রহের চৈতন্যটুকুকে আত্মসাৎ করা চাই। করে, তাকেই পাই কি আপনাকেই হারাই। কিন্তু এরা এত বল্‌ছে, যে এই "আমি"র ব্যবধান না সরালে কিছু কর্‌তে পার্‌বে না। হোল না, হোল না, কিছুই হোল না। এই শব্দের কথায়, স্পর্শের কথায়, রূপের কথায়, রসের কথায়, গন্ধের কথায় কারো কথায় কিছু হোল না, কিছুতেই আমার সেই আকাঙ্ক্ষার বস্তু আত্মধন মিলিল না। সাম্নে থেকে আমার "আমি"কে কেহ সরাতে পার্‌ল না; আমার দৃষ্টিও পরিষ্কার পথ পেল না। সব শত্রু সওয়া যায় কিন্তু গৃহ-শত্রুকে আর বরদাস্ত হয় না। এর জ্বালায় কিছুই কর্‌তে পেলাম না। আজ কত আশা প্রাণে ছিল, প্রথম দেখ্‌বার মত দেখা পাব বলে। আমিও এই 'আমি'র মূর্ত্তি ছাড়া এতদিন দুই চক্ষে আর কিছুই দেখি নাই, দেখ্‌বার যে কিছু আছে তাও জান্‌তাম না। প্রাণটা আজ বল্‌ছে—কর্‌ছ কি? তোমার সেই বিশিষ্টাঙ্গকে খোঁজ কর্‌তে বেরোও না? দেখার মত একবার দেখে লও না সব শূন্য করে, দিক সকলকে ফাঁকি দিয়ে, তবেই দেখ্‌তে পাবে যার জন্য জন্ম লয়েছ। পাগলের মত ছুটে গিয়ে তাই শব্দের পায়ে ধর্‌লাম, "ওগো শোনাও সে স্বর, যাতে করে আমার প্রাণ ঠাণ্ডা হবে, আমি তাকে পাব, পূর্ণ হব।" শব্দের সঙ্গে সঙ্গে কে ও আস্‌ছে? অতি সন্তর্পণে আমায় ছুঁয়ে ছুঁয়ে আমার অঙ্গে যেন অমৃতরস ঢেলে দিচ্ছে। সেই রসের ধারায় দুই চক্ষু বন্ধ হয়ে আস্‌ছে,—বস্ আমিও অন্ধ। রূপ এসে ধাক্কা দিচ্ছে। জলভরা চোখে দেখ্‌ব কি ছাই। সব যে ঝাপ্‌সা। ধাক্কার চোটে ছোঁওয়াটুকু মিশে গেল। কে নিয়ে গেল গো, রূপকে ত আমি চাই নাই। জোর জবরদস্তি করে সে আমায় কি দেখাবে। চোখে আমার দৃষ্টিশক্তি থাক্‌লে ত! সব কেড়ে

নিয়েছে ঐ পরশ! রূপ! তুমি বল্‌ছ, এই রাঙা হাত নইলে এত কি মিষ্টি লাগ্‌ত শুধু একটা পরশ? আমাকে ছাড়া তুমি তাকে পাবে কোথায়? হুঁস হোল তাই ত! তবে চেয়েই দেখিনা কেন কার হাতখানি, কেমন হাতখানি। যা! সব মাটি হয়ে গেল। তার চখে চোখ পড়্‌ল। সে চোখের কি দীপ্তিময় প্রভা। সে জ্যোতির আলোকে আমার চোখের কুয়াসা কেটে গেল। আমি সুন্দরকে দেখ্‌লাম। নয়ন পলকহীন, আর কথা কানে যায় না, গায়ে পরশ লাগে না। মূর্ত্তি, মূর্ত্তি! সর্ব্বত্র এই নীরব মূর্ত্তি! আকার যে আমায় পীড়া দিচ্ছে। ওগো সরাও একে নয়ন-পথ থেকে, নয় ত মর্‌লাম। আনন্দ অসহ্য হয়ে মৃত্যুকে আলিঙ্গন কর্‌তে চাচ্ছে। এসেছ রস! নেমে এসেছ রূপের সন্ধানে, একা সে কি কর্‌তে পারে দেখ্‌তে! তুমি আস্‌তেই এর আকার বদ্‌লে গেল। সে ত আর এখন একা নয়, সে যে এখন 'সরস' হয়েছে। আমি চিন্‌তে পারি নাই। ডাক না শব্দকে। স্পর্শ কোথায় গেল? শুধু রূপ! তুমি! আমার তা ভাল লাগ্‌ছে না। এই কি আমার প্রেয়! একে পেয়েই কি আমি পূর্ণ হ'ব! প্রেম জান্‌ব! মন বল্‌ছে "নয় নয়, এ সে নয়"। অনেক ডাকা-ডাকির পর শব্দ এসে হাজির হোল। তাকে জিজ্ঞাসা কর্‌লাম,— আচ্ছা, শব্দ! তুমিই বলনা স্পর্শকে ছেড়ে তোমার গতি আছে কি? কি বল্লে তার মুখ দেখ্‌বে না! কেন? সে তোমার সব কেড়ে নিতে চায়! পাগল, সব কেড়ে নিতে চায় ব'লেই ত তোমার আরও বেশী জোর চলে। ডাকাডাকি ভিন্ন তুমি ত আর কিছু জান না। কাছে থাকার সুখ বিধাতা তোমার কপালে লিখেন নাই। সে বরং পরশ বল্‌তে পারে। ছোঁওয়ার মত মধুর তুমি হ'তে জান কি? কি বল্‌ছ—"কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো, আকুল করিল প্রাণ"— একি ছোঁওয়া নয়? তবে আমার ছোঁওয়ার ধরণ আলাদা তা বল্‌তে পার। আমি গ্রাস কর্‌বার জন্য পাগল নই, তাই কাছে মিশে থাকা আমার আবশ্যক হয় না। স্পর্শ সে স্পর্দ্ধা রাখে বটে, তাই তার

জুলুম চলে। তার বিশ্বাস যে, সে কাছে গেলেই আদর পাবে। তার মনে শঙ্কা আছে, ভয় নাই, সে পীড়ন জানে কিন্তু নিজে জ্বালা বোঝে না। আমার সঙ্গে ওর তুলনা! মোট কথা সে সুখী করতে চায়, আর আমি সুখী হ'তে চাই। আমি স্বার্থপর? তা বলতে পার। প্রেমে স্বার্থত্যাগ চাই। হবে! আমি তা পারব না। শব্দ! তোমার কথা শুনে স্পর্শ হাস্‌ছে। সে বল্‌ছে "আমায় ছেড়ে ওর আধিপত্য? শুধু ডাকে মানুষ জাগে বটে, কিন্তু চিন্ময়কে পায় কি?" এখন তবে কি উত্তর দিবে তুমি? হাজার হোলেও তুমি হ'চ্ছ বহিরঙ্গ, আর স্পর্শ একেবারে অন্তরঙ্গ। কেন? একথায় তুমি আপত্তি করছ যে? ডাকও অন্তরঙ্গ হ'তে পারে। কান ছাড়াও কি ডাক পৌঁছায়? স্বর ভিন্নও কি শোনা সম্ভব? হাঁ সম্ভব তুমি বলছ, কেমন করে বল দেখি? আমার এই "আমি"র কাছে তা বলবে না। সে সব ভণ্ডুল করে দিবে। "যদি কোন দিন একে সরাতে পার, তবে দেখ্‌বে আমার শক্তি কি পর্য্যন্ত! এই "আমি" শব্দই তখন শব্দাতীত হয়ে তোমার অন্তরে এসে অধিষ্ঠান লাভ করবে, তখন তোমার "আমি" আর কাছে ঘেঁস্‌তে পাবে না। তোমাকে ছাড়্‌তে বাধ্য হবে, আমার প্রভুভক্তি দেখে। এই "আমি"র অন্তর্দ্ধানে তুমি বড় মিষ্ট বস্তু। তখন আর কি আমি তোমার বহিরঙ্গ থাক্‌তে পারি?" শব্দের এই কথা শুনে একটু চিন্তা করে দেখ্‌লাম, কথাটা সত্য বটে। দেখা যাক্ এখন পরশ কি বলে। কিন্তু তাকে পাই কোথায়? শব্দকে স্মৃতির ভাণ্ডারে জোর করে বেঁধে রেখেছিলাম, তাই অত সহজে ওকে পেলাম। কিন্তু স্পর্শ যে ওর আধারের সঙ্গে আসা-যাওয়া করে। তাকে তেমন করে না চাইলে সে কারো খাতিরে কাছে আসে না, এই হয়েছে মুস্কিল। এখন তেমন চাওয়া চাই কি করে? সে চাওয়ার আমি জানি কি? সে শুভলগ্ন আমার কে ঘটাবে? গৃহশত্রু যে সদা প্রহরী। শক্ত পাহারা। জন্মাবধি এই "আমি"র দৌরাত্ম্যে মারা পড়্‌লাম। কেউ একে সরাতে পার্‌লে না। মানুষ বুঝে

সবাই নির্জীব হয়ে পড়ে, আসল কথাই তাই। নয় ত এমনও ত ঢের দেখেছি যে এক পরশই সমগ্র মানুষটাকে কাবু করে রেখেছে। দেখেছি বলেই সাধও হয়েছিল পেতে। কিন্তু পেলাম কৈ? এরা পাঁচ জনাই নাকি আমার প্রেয়ের প্রাণ স্বরূপ। এদের ছাড়া তবে সে দাঁড়াবে কার জোরে? শব্দের সাড়া ভিন্ন, স্পর্শের মোহ বিনা, রূপের চটক নইলে রসের ধারা বহে না, গন্ধে অন্ধ করে না ত। তাই বল্‌ছিলাম—হোল না, হোল না, কিছুই হোল না। আমি আমার বিশিষ্টার্দ্ধকে খুঁজে পেলাম না, আমার প্রেয় মিলিল না, আমি নিত্য বস্তু কি জান্‌লাম না। এরা সবাই মিলে আমাকে নিয়ে একটা হট্টগোল বাঁধাল। তাতে আমারও সাধ মিটিল না, ইষ্টসাধন হোল না, এদেরও তুষ্টি দেখ্‌লাম না। আমি কি জানি যে এদের নিয়ে কেবল বেগার খেটেই মর্‌ব।

এবারে সকলকে তাড়াব। তাড়িয়ে দিয়ে আপনার মনে একা থাক্‌ব। এতে প্রেয়কে পাই বা না পাই, কোন আপযোস্ নাই। চাই না আমি মাতৃত্ব, আমার যৌবনে কাজ নাই। আবার কানের কাছে ফিসির ফিসির, কে ও কথা বল্‌তে চায়? শুধু নাম শোনাবে? কে তুমি শব্দকে আশ্রয় করে এসেছ? তুমি কি প্রেম বাঁচাতে জান? তাই ত এ যে শুধু নাম শোনান নয়। নাম শোনাতে শোনাতে একেবারে বুকে নাম জাগিয়ে দেওয়া। সে নামধ্বনি শুনে, সে নামকে নাম ধরে ডাক্‌তে ইচ্ছা হচ্ছে আপনা-আপনি মনের মধ্যে। এ কার প্রেরণা! সে নাম জপ্‌তে জপ্‌তে জগৎটা সে নামময় হয়ে উঠ্‌ল। এখন যে সে নামে বাঁধা পড়্‌লাম, আর যাই কোথা। শব্দ! তুমি একি কর্‌লে! আমি যে পাগল হয়ে যাব। পরশ তখন আমার চৈতন্যকে নিয়ে বসে রইল! এ কার পরশ! এ স্পর্শনে আমি ক্রমে পূর্ণ হয়ে উঠ্‌ছি। এই কি আমার অজানা অর্দ্ধ? আমাকে পূর্ণ করে দিতে এসেছে? যার এ প্রাণ-জাগান পরশ, তার তবে রূপ কেমন? এতদিন যে রূপ দেখে এলাম, দেখে ভুলে রইলাম, এ ত

সে নয়। এ যে আমারি চৈতন্যে সে রূপ প্রতিফলিত হয়ে আমারি স্বরূপ দেখাচ্ছে। তবে কি তার সঙ্গে এক হয়ে গেছি? তাও কি হয়? অত বড়, অত মহান নিত্য বস্তু, আর আমি এক? সেও যা আমিও তা? হতেই পারে না।

আবার ধাঁধাঁ। চোখ দু'টাকে রগড়াতে রগড়াতে রক্তবর্ণ করে ফেল্লাম, তবু ধাঁধাঁ ছাড়ে না। আমি দূরে বসে সে রূপের—সে দেবতার পূজা কর্‌তে চাইছিলাম। ভক্তিতে মুক্তি জেনে তার আরাধনা কর-বার আমার বাসনা হয়েছিল। কিন্তু এ আত্মরূপকে কেমনে পূজা করব। হে বিধাতাপুরুষ, এ তোমার কি রঙ্গ? আমি ত কিছুই ঠাওর করতে পাচ্ছি না। এতদিন আমি আমার অঙ্গের লাবণ্যছটা দিয়ে, আমার ভোক্তাকে আমার প্রিয় জেনে,' কত কত ভাবে আমার স্বরূপ দেখিয়ে এলাম তাকে ভোলাব বলে, আর তিনিই কিনা কৌশলে সে বহিঃ-প্রকাশকে আপনা-অঙ্গে ধারণ করে আমায় দেখাচ্ছেন—আমায় লজ্জা দিতে। এম্‌নি করে আক্কেল দিবে জান্‌লে, হে রূপ! আমি পায়ে ধরে তোমায় পূজা কর্‌তে চাইতাম না। আমি স্বচ্ছ কাচের ভিতর আপন রূপ দেখে দেখে মোহিত হতাম বটে, কিন্তু তাতে আমার আত্ম-বিস্মৃতি, আত্ম-তৃপ্তি ঘটাতে পারৃত না বলেই ত তোমার খোঁজে বেড়িয়েছিলাম। হে আমার পূর্ণকারয়িতা! শুধু কি তব নামে মধু ঝরে? পরশে মোহ আনে? তোমার কোন আত্মরূপ নাই। এতদিন চক্ষুতে যেরূপ দেখিয়েছ তবে তাই দেখ্‌তে দাও, আমি দূরে বসে তোমার পূজা করি। এই দূরে রেখে দেখ্‌তে চাই বলেই তুমি কি আমাকে অতৃপ্ত রেখে অমন আঘাত দিচ্ছ? দেখা ত শোনা নয় যে কানের ভিতর দিয়ে গিয়ে মরমে পৌঁছিবে? সে ত পরশ নয় যে অঙ্গেই লেগে থাক্‌বে? দেখা হোল দৃষ্টিতে, সে দৃষ্টিকে দেহ থেকে বের ক'রে না দিলে, সে কেমন করে দেখ্‌বে বল? বাইরের চক্ষুকে দৃষ্টিহীন করে দিয়ে তুমি আমার অন্তশ্চক্ষু হয়ে বস্‌বে? আমি তা চাই না, আমি তোমার চক্ষে দেখ্‌তে

চাই না। আমি আমারি চক্ষু লয়ে তোমার সে দর্শন চাই, যাতে আমি চোখ চেয়ে তোমাকে দেখে বল্‌তে পারি, "জনম অবধি হাম রূপ নেহারিনু, নয়ন না তিরপিত ভেল।" তা হতে পারে না কেন? চোখ বুজেই সে রূপ দেখা যায়, চোখ মেলে নয়। তাই তুমি কেবলি সরে সরে যাচ্ছ? কেবল অদর্শন, কেবল অদর্শন! ধ্যান ধারণা আমার আসে না। "কেন তুমি মূর্ত্তি হয়ে এলে, রহিলে না ধ্যান ধারণায়"—একথার মর্ম্ম আমি বুঝ্‌তে পারি না। আমি চাই আকার। জানি আকারে পীড়া দেয়, মিলনে বিরহের আশঙ্কা জাগায়। তবু আকার না দেখ্‌লে আমার অবসাদ আসে, আমি ধর্‌তে ছুঁইতে না পার্‌লে ক্ষুব্ধ হই। হে নির্ম্মম! হে পাষাণ প্রতিমা! কৃপা করে দরশন দাও, আর লুকিয়ে থেক না। তুমি আমার বাঞ্ছা-মত দেখা দিলে আমি কখনও তোমাকে পাব না? কেন? দূরত্ব ঘুচ্‌বে না বলে? তবে শেখাও দেখ্‌তে সে দেখা, যে দেখায় আত্মরূপ দেখে সমগ্র তোমাকে পাব, পেয়ে পূর্ণ হব। তোমাতে মিলে এক হোলে, তবেই আনন্দের উদ্ভব হবে। তখনই যথার্থ আমার মাতৃত্ব আস্‌বে, যার আগমনী হয়ে যৌবন এসেছে! যার জন্যে আমার ঘরে এত আয়োজন! তখন বুঝি নাই। অঙ্গ থেকে অঙ্গীকে ধরা, আনন্দকে কোলে করা! এ ক্ষেত্রে কেহ তবে বন্ধ্যা নয়! সকলেই মা হবার যোগ্যা! সকলেরই সে অধিকার আছে! অঙ্গ যখন মাতৃত্বের যোগ্য উপাদানে গঠিত হবে, তখন প্রেয়ের পিতৃত্বের পূর্ণতা এসে ইহাতে অনুপ্রাণিত হয়ে, এই আনন্দকে গড়ে তুল্‌বে, বক্ষে তখন আপ্‌নিই ক্ষীরধারা বইবে। এক আনন্দের উৎপত্তিতে জগৎ-সংসার আনন্দময় হয়ে উঠ্‌বে। আর অবসাদ থাক্‌বে না। আকাঙ্ক্ষার বস্তু কিছুই রবে না। আমি পূর্ণতাকে পেয়ে বল্‌তে পার্‌ব "আনন্দংরূপমমৃতম্"। তখন অমৃত আস্বাদন করে আমি অমর হব। এই অনিত্য অঙ্গের আশ্রয়ে এসে, এই পঞ্চে-ন্দ্রিয়ের সংস্পর্শে আমার জীবন সার্থক হবে, আমি ধন্য হব। তখন

আমার সৌরভে বিশ্বলোক আমোদিত হবে। তখন জান্‌ব, যে শব্দ সেই স্পর্শ; যে স্পর্শ সেই রূপ; যে রূপ সেই রস; যে রস সেই গন্ধ। পৃথকভাবে সকলেই একের সন্ধানে আমায় লয়ে যাবে। আমি তখন এই পাঁচেতেই আমার প্রেয়কে প্রত্যক্ষ করব, ক'রে ভক্তিভরে প্রণতমস্তকে ইহাদের সেবা-দাসী হয়ে থাক্‌ব। আমার আত্মার পরিতৃপ্তি এইখানে। তবে হে আমার আনন্দ-দাতা! যদি মাতৃত্বে গরীয়সী কর্‌বে তবে সন্তানকে কখনও বুক ছাড়া করো না, আমার এ পাওয়া কেড়ে নিও না। বুক জুড়ে এ আনন্দ থাক্‌লে, যৌবন গতেও আমার জরা আস্‌বে না; বার্দ্ধক্যের জড়তা আমি জানব না; আমার দেহগ্রন্থী শিথিল হবে না। আমি এক উদ্দাম-স্রোতের ন্যায় সংসারের সকল আবর্জ্জনা ঠেলে নিয়ে, সেই অতলের অন্তঃসাৎ করাইব। তখন ছোটয় বড়য় মিশে একাকার হয়ে গিয়ে, নিয়ত এক মহান শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধে বিভোর হয়ে বল্‌তে থাক্‌ব "সান্দ্রানন্দং স্পৃশতি ঝটিতি ব্রহ্ম পরমম্"।

শ্রীজগদম্বা দেবী।

নিবেদন

হে মোর বিজয়ী রাজা! এস তবে আজ
সমর-উল্লাস-ভরা বিজয় হুঙ্কারে,
দর্পভরে সগৌরবে! ওগো রাজ রাজ!
এস আজ রুদ্ধ এই অন্তর দুয়ারে!

ছিন্ন কর বক্ষ মোর কৃপাণে তোমার,
চূর্ণ করে দাও মোর সোনার মন্দির!
ধূলিসাৎ হ'য়ে যাক্ পরাণ আধার
বিজয় দুন্দুভি তব বাজুক গম্ভীর!

আমি অশ্রুজল চ'খে পরাইব আজ
জয়-মাল্য তব কণ্ঠে, ওগো রাজ রাজ!

নারায়ণ

১ম খণ্ড—৫ম সংখ্যা] [চৈত্র, ১৩২১ সাল

পৌরাণিকী কথা।

তন্ত্র ও ভক্তিসূত্র।

পুরাণ বুঝিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে শাস্ত্রের উপাসনা-তত্বটা একটু বুঝিতে হইবে। উপাসনা-তত্বের দুইটি শাখা আছে; এক, তান্ত্রিকী উপাসনা, দ্বিতীয়, বৈষ্ণব উপাসনা। বৈষ্ণব উপাসনা-পদ্ধতির মধ্যে যে তান্ত্রিক সিদ্ধান্ত নাই, এমন কথা বলি না; তবে যামুন মুনি এবং রামানুজাচার্য্য যে ভাবে ও পদ্ধতিক্রমে উপাসনা-তত্ব বুঝাইয়াছেন, তাহা তন্ত্র হইতে অনেকটা পৃথক, কতকটা বিরোধীও বটে। পুরাণে তান্ত্রিক সিদ্ধান্ত অনুসারেই বহু অখ্যায়িকা এবং উপাখ্যান রচিত হইয়াছে; কাজেই প্রথমে তান্ত্রিক সিদ্ধান্তেরই একটু আলোচনার আবশ্যক হইতেছে। বলিয়া রাখা ভাল যে, তান্ত্রিক সিদ্ধান্ত উপনিষদের বিরোধী নহে; অনেক স্থলে বৈদিক উপনিষদের প্রমাণস্বরূপ বচন গ্রহণ করিয়া তন্ত্র বিচার করিয়াছেন। তান্ত্রিক উপনিষদ্ একসময়ে এদেশে প্রচলিত ছিল, এখন লোপ পাইয়াছে। বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতির উদ্‌যোগে শ্রীযুত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয় কয়েকখানা তান্ত্রিক উপনিষদের আবিষ্কার করিয়াছেন। সেসকল মুদ্রিত না হইলে বুঝা যাইবে না তান্ত্রিক এবং বৈদিক উপনিষদে পার্থক্য কিসে এবং কতটুকু।

তন্ত্র বলেন জ্ঞাত এবং জ্ঞেয় বস্তুর জ্ঞান লইয়াই অজ্ঞাত এবং অজ্ঞেয় বস্তুর পরিচয় সংগ্রহ করিতে হয়। আমি আছি, আমি দেখিতেছি, শুনিতেছি, অনুভব করিতেছি, ইহাই আমার মূল জ্ঞান। এই জ্ঞান হইতেই অন্ত জ্ঞানের উৎপত্তি। উপনিষদ্ বলিতেছেন যে, আত্মাই জ্ঞানের প্রকাশক; অতএব আমি আছি—এই জ্ঞানটাই আত্মজ্ঞান। এই জ্ঞান হইতেই আমি বুঝিতেছি যে, আমার আত্মা আছে। আমি ছাড়া জগতে—বিশ্বসৃষ্টিতে আর যাহা কিছু আছে বা থাকিতেছে, তাহা যখন আছে তখন সেসকলের মধ্যেই আত্মা আছে; নহিলে সেসকল সামগ্রী থাকিত না, এবং তাহাদের অস্তিত্বের বোধ আমার হইত না। বিশ্বব্যাপী আত্মার এবং দেহব্যাপী আত্মার মিলনচেষ্টা হইতেই উপাসনার উৎপত্তি। একা আমি থাকিতে পারি না, আমার একটা অবলম্বন চাই, তাই বাহিরের তোমাকে খুঁজিয়া বেড়াই। এই অনুসন্ধানই উপাসনা। উপাসনা-তত্ত্বের গূঢ় সিদ্ধান্তসকলের আবৃত্তি এখন করিব না, তাহা গভীর ও বিশাল। উহার বিচার-পদ্ধতিও অতিশয় কঠোর ও সূক্ষ্ম। আপাততঃ পুরাণের উদ্দেশ্য বুঝিতে যতটুকুর প্রয়োজন, স্বতঃসিদ্ধরূপে ততটুকু গ্রহণ করিয়া আমার বক্তব্য প্রকাশ করিব। উপনিষদ্ বলিতেছেন যে, বিশ্বব্যাপী আত্মা চিন্ময়, অদ্বিতীয়, নির্গুণ, নেতি নেতি সিদ্ধ, অবাঙমনসগোচর; তাহার উপাসনা করি কেমন করিয়া? কুলার্ণব তন্ত্র শ্রীরামতাপনীয় শ্রুতি অনুসারে বলিতেছেন—

> "চিন্ময়স্যাদ্বিতীয়স্য নিষ্কলস্যাশরীরিণঃ।
> উপাসকানাং কার্য্যার্থং ব্রহ্মণোরূপকল্পনা॥"

অর্থাৎ উপাসকের কার্য্যসিদ্ধির জন্যই চিন্ময়-জ্ঞানময়-অদ্বিতীয়-অখণ্ড-অশরীরী ব্রহ্মের রূপ কল্পনা করা হইয়া থাকে। এই হেতু রুদ্রযামলে বলা হইয়াছে যে,

"সর্ব্বদেবময়ীং দেবীং সর্ব্বমন্ত্রময়ীং পরাম্।
আত্মানং চিন্তয়েদ্দেবীং পরমানন্দরূপিণীম্॥"

যখন আত্মা আমাতেও আছেন এবং সর্ব্বভূতে, সর্ব্বদেবতায়, সৃষ্টির সর্ব্বস্বে বিরাজ করিতেছেন, তখন সেই আত্মাকেই পরমানন্দরূপিণী ইষ্টদেবী মনে করিয়া আত্মারই উপাসনা করিবে। গন্ধর্ব্বতন্ত্র শেষ কথা বলিয়া রাখিয়াছেন; তাহা এই,—

"যথা ফেনতরঙ্গাদি সমুদ্রাদুত্থিতং মুনে।
সমুদ্রে লীয়তে তদ্বজ্জগদাত্মনি লীয়তে॥

অর্থাৎ সমুদ্র হইতে যেমন সমুদ্রের ফেন ও তরঙ্গ উত্থিত হয় এবং সমুদ্রেই লীন হয়, তেমনি আত্মা হইতেই জগৎ উত্থিত এবং আত্মাতেই লীন হইবে। আমার উপাস্য ইষ্টদেবতা ও আমি বা আমার আত্মা—অহং দেবি ন চান্যোঽস্মি—আমিই দেবী, আমা ছাড়া অন্য কেহ নাই, থাকিতে পারে না। শেষে তন্ত্র বলিতেছেন,—

"আত্মস্থাং দেবতাং ত্যক্ত্বাবহির্দ্দেবং বিচিন্বতে।
করস্থং কৌস্তুভং ত্যক্ত্বা ভ্রমতে কাচতৃষ্ণয়া॥

অর্থাৎ আত্মস্থ দেবতাকে পরিহার করিয়া যে বাহিরের দেবতার উপাসনা করে সে সাধক স্বীয় করস্থিত কৌস্তুভ মণি ত্যাগ করিয়া কাচের অন্বেষণে চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়ায়। অগ্নিপুরাণ, বিষ্ণুপুরাণ, লিঙ্গপুরাণ প্রভৃতি পুরাণে এই সিদ্ধান্তের অনুকূল বহু বচন পাওয়া যায়। প্রহ্লাদ্ বলিয়াছিলেন আমার হরি আমাতেও যেমন ভাবে বিরাজ করিতেছেন, বিশ্বচরাচরে তেমনই প্রকটভাবে বিরাজ করিতেছেন। পিতা হিরণ্যকশিপু জিজ্ঞাসা করিলেন—এই স্ফটিক স্তম্ভে তোমার হরি আছেন? যদি থাকেন ত, তাঁহাকে প্রকট হইতে বল। প্রহ্লাদের বাক্য মিথ্যা হইবার নহে, আত্মা নরহরিরূপে স্ফটিক স্তম্ভ ভেদ করিয়া প্রকাশ হইলেন। ধ্রুব পদ্মপলাশলোচন শ্রীহরিকে

খুঁজিয়া বাহির করিবার উদ্দেশ্যে গহন বনে প্রবেশ করিল ; একনিষ্ঠ-বুদ্ধি হেতু সে সিংহ শার্দ্দূলকেও হরি বলিয়া আহ্বান করিল। কিন্তু সর্ব্বাগ্রে দেহস্থ আত্মাকে না চিনিতে পারিলে বাহিরের বিশ্বাত্মাকে ঠিকমত চেনা যায় না বলিয়াই দেবর্ষি নারদ আসিয়া ধ্রুবকে দীক্ষিত করিলেন। ধ্রুব দীক্ষা পাইয়া তপস্যা করিল এবং শ্রীহরির দর্শন লাভ করিল। মন্ত্রের দ্বারা দীক্ষা হয়। সে মন্ত্র কি ?

"মননাত্ত্রায়তে যস্মাত্তস্মান্মন্ত্রঃ প্রকীর্ত্তিতঃ॥"

মনন হইতে অথবা চিন্তা হইতে যাহার সাহায্যে ত্রাণ পাওয়া যায় তাহাই মন্ত্র। বেদ মন্ত্র স্বীকার করিয়াছেন, গায়ত্রী মন্ত্রই বেদের প্রধান মন্ত্র। মন্ত্র জপের প্রভাবে চিত্তবৃত্তির নিরোধ হয়, মন নির্ব্বাতনিকম্প প্রদীপের ন্যায় এক চিন্তায় মগ্ন থাকিতে পারে। চিত্তবৃত্তির নিরোধ হইলেই আত্মদর্শন সম্ভবপর হইতে পারে। এইহেতু যামলে লিখিত হইয়াছে যে, "দেবতায়াঃ শরীরন্তু বীজাদুৎপদ্যতে ধ্রুবম্"—ইষ্টদেবতার রূপ বীজ-মন্ত্র জপ করিতে করিতে আপনা-আপনি ফুটিয়া উঠে ; "তস্মাৎ বীজাত্মকং মন্ত্রং জপ্ত্বা ব্রহ্মময়ো ভবেৎ" অতএব বীজাত্মক মন্ত্র জপ করিয়া ব্রহ্মময় হইতে পার। বৈষ্ণব সাধক হরিনামকেই মহামন্ত্র জ্ঞান করিয়া নামজপের মাহাত্ম্য ঘোষণা করিয়াছেন। বিশ্বসার তন্ত্র বলেন,—

"অশুচৌ বা শুচৌ বাপি সর্ব্বকালেঽপি সর্ব্বদা।
পূজয়েৎ পরয়া ভক্ত্যা নাত্র কার্য্যাবিচারণা॥"

অর্থাৎ শুচি অশুচি বিচার না করিয়া সর্ব্বকালে, সর্ব্বাবস্থায় ইষ্ট-মন্ত্র জপ করিয়া ইষ্টদেবীর মানস অর্চ্চনা করিবে। "হেলয়া শ্রদ্ধয়া বা" বৈষ্ণবের এই উক্তিও তন্ত্রে পাওয়া যায়। তন্ত্র আবার বলিয়াছেন—"জপাৎ সিদ্ধিঃ, জপাৎ সিদ্ধিঃ, জপাৎ সিদ্ধিঃ" বার বার তিনবার বলিলাম জপেই সিদ্ধি হইবে, ইহাতে কোন সংশয় নাই।

ইহাই হইল তন্ত্রোক্ত উপাসনা-পদ্ধতির গোড়ার স্থূল কথা। তন্ত্র বলেন, ধ্যান কর আর নাই কর, মন্ত্র জপ করিতে করিতে তোমার ভাবানুকূল রূপ তোমার হৃদয়পটে আপনিই ফুটিয়া উঠিবে। সেই রূপ দেখিয়া ভক্ত সাধক ভক্তির সম্যক উন্মেষের উদ্দেশ্যে স্তবস্তুতি করেন, রূপ বর্ণনা করেন। সেই স্তবস্তুতি এবং রূপ বর্ণনা শুনিয়া শিষ্য একটা রূপের কল্পনা করিয়া দেবীপ্রতিমার সৃষ্টি করেন। ইষ্টদেবীর সেই প্রকটমূর্ত্তি দেখিয়া সাধারণ লোকে তাহারই ধ্যান করিতে চেষ্টা করে; এই ধ্যানের ফলে চিত্তবৃত্তির নিরোধ হয়, সাধকের জীবন ধন্য হয়। আমাদের বাঙ্গালা দেশে আজকাল যেমন মৃন্ময়ী প্রতিমা গড়াইয়া পূজা করা হয়, পূর্ব্বে এমন ছিল না। পূর্ব্বে বাঙ্গালার হিন্দু যন্ত্রের পূজা করিতেন, যন্ত্রের উপর হোম করিতেন এবং মন্ত্র জপ করিতেন। রাজা জগদ্রাম রায়ের সময় (১৪শ শতাব্দী) হইতে বাঙ্গালায় আধুনিক প্রথামত দুর্গোৎসব প্রচলিত হইয়াছে। গৃহস্থের গৃহে কালী গড়াইয়া পূজা আগমবাগীশ কৃষ্ণানন্দই (১৬শ শতাব্দী) চালাইয়া গিয়াছেন। জগদ্ধাত্রী পূজা মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের সময় হইতেই প্রচলিত হইয়াছে। সরস্বতী পূজা কখনই মাটির প্রতিমা গড়াইয়া হইত না; গ্রন্থের পূজা হইত এবং দেবীসূক্ত পাঠ করিয়া হোম হইত। প্রতিমা গড়াইয়া সরস্বতী পূজা বোধ হয় শত বৎসরের অধিক হইবে না। বাঙ্গালা ছাড়া ভারতের আর কোন প্রদেশে এমন ভাবে মৃন্ময়ী প্রতিমার পূজা হয় না। মহারাষ্ট্রদেশে গণপতি উৎসবে গণেশের মূর্ত্তি গড়াইয়া পূজা হয় বটে, কিন্তু সে মূর্ত্তি-গঠন উৎসবের অঙ্গ বিশেষ, উপাসনার আলম্বন রূপে গ্রাহ্য নহে। ভারতবর্ষের অন্য সকল প্রদেশে ঘটস্থাপনা করিয়া, মন্ত্র অঙ্কিত করিয়া হোমযাগাদি যথারীতি হয়, প্রতিমা পূজা হয় না। তবে প্রতিষ্ঠিত দেবতার মন্দিরে যাইয়া পূজার ব্যবস্থা আছে বটে। সেসকল মন্দিরে শিবলিঙ্গ ছাড়া যন্ত্রাঙ্কিত প্রস্তরখণ্ড থাকে, তাহারই উপর সোনারূপার মূর্ত্তি গড়াইয়া আরোপ করা হয় মাত্র। কাশীর অন্ন-

পূর্ণা আমাদের তন্ত্রোক্ত অন্নপূর্ণার মূর্ত্তি নহে, এক খণ্ড পাথরের উপর সোনার মুখ বসান মাত্র। কাশীর অনেক মন্দিরে পুরাতন সূর্য্য-মূর্ত্তি, প্রজ্ঞাপারমিতার মূর্ত্তি, আধুনিক দেবতার আকার ধারণ করিয়া পূজিত হইতেছেন। অনেক স্থলে ধ্যানী বুদ্ধকে বিষ্ণু সাজাইয়া পূজা চলিতেছে। বাঙ্গালায় যেমন ঘরে ঘরে মাটির মূর্ত্তি গড়াইয়া পূজা হয়, পূজান্তে তাহার বিসর্জ্জন হয়, এ ব্যবস্থা ভারতবর্ষের অন্য কোন প্রদেশে নাই, পূর্ব্বে বাঙ্গালায় ছিল না। দশম কি একাদশ শতাব্দীর পর হইতে এই পদ্ধতির ধীরে ধীরে প্রচলন হইয়াছে। মাটির মূর্ত্তি আমরা নির্ম্মাণ করি বটে, কিন্তু পূজা করি আত্মার—আত্মশক্তির; প্রতিমা প্রতীকের মতন সম্মুখে থাকে মাত্র। দুর্গোৎসব পদ্ধতির বা কালীপূজা পদ্ধতির বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলে আমার কথার যথার্থতা সপ্রমাণ হইবে। কূর্ম্ম পুরাণে এই কথাটা স্পষ্ট করিয়া বলিয়া দেওয়া আছে। কূর্ম্ম পুরাণ বাহিরের মূর্ত্তি দেখিয়া ধ্যান করিতে নিষেধ করেন; উপদেশ এই যে বাহিরের মূর্ত্তি আলম্বন মাত্র, ভিতরের ধ্যান সাধকের সামর্থ্য অনুসারে চিত্তবৃত্তিনিরোধের ফলে আপনা-আপনি ফুটিয়া উঠে।

এইবার বৈষ্ণববাদ এবং ভক্তিশাস্ত্রের সিদ্ধান্তের কথা তুলিতে হইবে। নারদ এবং শাণ্ডিল্য ভক্তিশাস্ত্রের সূত্রকার; স্বপ্নেশ্বরাচার্য্য, রামানুজাচার্য্য, বল্লভাচার্য্য প্রভৃতি উহার ব্যাখ্যাতা। একটা কথা এইখানে বলিয়া রাখিব। ইংরেজের আমলে মুদ্রাযন্ত্রের প্রচার হইলে আমাদের সমাজে বেদ, উপনিষৎ ও পুরাণতন্ত্রের চর্চ্চা কিছু হইতেছে বটে, পরন্তু বৌদ্ধপ্রভাবের পর হইতে,—ভট্টকুমারীলের সময় হইতে অদ্বৈতাচার্য্যের সময় পর্য্যন্ত, এই হাজার বৎসরকাল যে আচার্য্য-পরম্পরা ভারতবাসীর ধর্ম্মের ভাবকে আকারিত এবং নিয়ন্ত্রিত করিয়াছেন, তাঁহাদের বিষয় বিশেষ রকমের আলোচনা ইংরেজীশিক্ষিত বিদ্বজ্জনসমাজে তেমন হয় না। অথচ শঙ্করাচার্য্যের আমল হইতে মোগল পাঠানের আমল পর্য্যন্ত এবং ইংরেজের প্রথম

আমলের ভারতবর্ষকে বুঝিতে হইলে এই আচার্য্য-পরম্পরার মতামতের আলোচনা এবং বিশ্লেষণ করিতেই হইবে। যাঁহাদিগকে উদ্দেশ করিয়া আমি এই সন্দর্ভ-পরম্পরা লিখিতেছি, তাঁহারা আচার্য্যগণের মতবাদের সহিত সুপরিচিত থাকিলে, আমাকে অনেক কথা বার-বার বলিতে হইত না; ব্যর্থ প্রতিবাদের পিপীলিকা-দংশনও আমাকে সহিতে হইত না। যাক্ সে কথা,—স্বপ্নেশ্বর শাণ্ডিল্য সূত্রের ভাষ্যের গোড়াতেই বলিতেছেন—"প্রজাদিগের মহারাজার ন্যায়, ঐহিক এবং পারত্রিক বিবিধ ফলদাতা, বন্ধন এবং মোক্ষাদি কার্য্যে প্রভু, সৃষ্টি-স্থিতি-সংহার-কর্ত্তা একজন ঈশ্বর আছেন এবং পিতা যেমন সাধারণতঃ সকল পুত্রের উপর স্নেহশীল হইলেও ভক্তিমান পুত্রদিগের উপর বিশেষ অনুগ্রহ করেন, তিনিও সেইরূপ সকল জীবের প্রতি স্নেহশীল হইলেও ভক্তদিগের প্রতি বিশেষ অনুগ্রহ করেন।" স্বপ্নেশ্বর স্পষ্ট বলিয়াছেন যে, দ্বৈতবাদ না হইলে উপাসনা হয় না। যেখানে উপাসনার কথা, শাস্ত্র সেইখানেই দ্বৈতবাদী; বেদই বল, উপনিষদই বল, যখন উপাসনার কথা উঠিয়াছে তখনই তুমি প্রভু আমি দাস, তুমি পিতামাতা আমি পুত্র ইত্যাদি ভাবের উন্মেষ ঘটাইয়া তোমায় আমায়, ঈশ্বরে এবং জীবে বিষম পার্থক্যের সৃষ্টি করা হইয়াছে। মানুষকে উপাসনা করিতেই হইবে; উপাসনা জীবের প্রকৃতিসিদ্ধ ব্যাপার। নিজের অপেক্ষা প্রবলতর শক্তি দেখিলেই মানুষ সেই প্রবল শক্তির উপাসনা করিয়াই থাকে। অতএব রামানুজাচার্য্য বলিতেছেন যে, মনুষ্যে যখন উপাসনার প্রবৃত্তি প্রকৃতিগত, সুতরাং সনাতন, তখন উপাস্যও জীব হইতে নিত্য স্বতন্ত্র এবং সনাতন। কাজেই বলিতে হয় যে, জীবে ও ঈশ্বরে, উপাস্য এবং উপাসকে কখনই সম্মিলন সম্ভবপর নহে; উভয়েই স্বতন্ত্র এবং পৃথক, উভয়ই নিত্য। ইহা মায়াবাদের স্পষ্ট প্রতিবাদ। স্বপ্নেশ্বর বলেন যে, বেদান্তে ও উপনিষদে যাহা থাকে, বা যাহা আছে তাহা থাকুক; উহার সহিত মনুষ্যসমাজের কোন সম্পর্ক নাই; উহা আরণ্যক

শাস্ত্র। সাধারণ মানুষ ঘর-গৃহস্থলী চালাইবে, ভক্তিশ্রদ্ধা করিবে, পূজা-পাঠ করিবে। সাধারণ মনুষ্যের পক্ষে অদ্বৈতবাদ অবোধ্য। লোকসমাজে অদ্বৈতবাদ প্রচার করিলে, জীব-শিব এক বলিয়া কীর্ত্তন করিলে নাস্তিকতার পুষ্টি হইয়া থাকে, ঘুরিয়া-ফিরিয়া মানুষ বুদ্ধের শূন্যবাদের গর্ত্তে আসিয়া পতিত হয়। অতএব লোকসমাজের হিতের জন্য দ্বৈতবাদ, পূজ্য-পূজক ভেদবাদ প্রচার করা সর্ব্বথা কর্ত্তব্য। ইহার পরে শাঙ্কর মত এবং বৈষ্ণব মতের সামঞ্জস্য করিতে যাইয়া মাধ্বাচার্য্য, বল্লভাচার্য্য, নিম্বাদিত্য প্রভৃতি কত প্রতিভাশালী আচার্য্য যে কত মতের এবং কত সম্প্রদায়ের সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহার হিসাব করিয়া বলা যায় না। অদ্বৈতবাদ, দ্বৈতবাদ, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ, দ্বৈতাদ্বৈতবাদ—এমন কত বাদই আছে। সকল বাদের সকল রকমের সিদ্ধান্ত নানা আকারে পুরাণে স্থান পাইয়াছে। দ্বৈতবাদমূলক বৈষ্ণবী ভক্তিব্যঞ্জক গোটাকয়েক শ্লোক বিষ্ণুপুরাণ হইতে উদ্ধৃত করিয়া দেখাইব :—

"যা প্রীতিরবিবেকানাং বিষয়েষনপায়িনী।
ত্বামনুস্মরতঃ সা মে হৃদয়ান্মাপসর্পতু ॥
যুবতীনাং যথা যূনি যূনাঞ্চ যুবতৌ যথা।
মনোমে রমতাং তদ্বৎ পরমাত্মনি কেশবে ॥
নাথ যোনিসহস্রেষু যেষু যেষু ব্রজাম্যহম্।
তেষু তেষ্বচ্যুতা ভক্তিরচ্যুতাংস্তু সদা ত্বয়ি ॥"

অর্থাৎ "অবিবেকীদিগের ভোগ্য বস্তুতে যাদৃশ স্থির প্রীতি উৎপন্ন হয়, তোমাকে অনুক্ষণ স্মরণ করতঃ আমার হৃদয়েও সেইরূপ প্রীতি জন্মিয়াছে; উহা যেন আমার হৃদয় হইতে আর অপসৃত না হয়। যুবতীদিগের যুবা পুরুষের উপর এবং যুবা পুরুষের যুবতীদিগের উপর চিত্ত যেরূপ আসক্ত হয়, আমার চিত্ত যেন সর্ব্বদা সেই পরমাত্মা কেশবের প্রতি সেইরূপ আসক্ত থাকে। হে নাথ,

হে অচ্যুত, আমি যে যে যোনিতেই জন্ম গ্রহণ করি না কেন, সেই-সকল জন্মেতেই তোমার প্রতি আমার যেন স্থির ভক্তি থাকে।” এই ভাবের কত শ্লোক যে পুরাণে আছে তাহার আর হিসাব করিয়া বলা যায় না। বাল্মীকি রামায়ণ হইতে একটা শ্লোক তুলিয়া দিব। হনুমান্ বলিতেছেন (সুন্দরাকাণ্ড)—

“যাবদ্রামকথা লোকে তাবৎ প্রাণান্ বিভর্ম্যহম্।
তাবৎ স্থাস্যামি মেদিন্যাং তবাজ্ঞামনুপালয়ন্ ॥”

গীতায় ভক্তিযোগ বর্ণনকালে দ্বৈতবাদের এই সিদ্ধান্তটা শ্রীভগবান্ স্পষ্ট করিয়া বলিয়া দিয়াছেন—

“সততং কীর্ত্তয়ন্তো মাং যতন্তশ্চ দৃঢ়ব্রতাঃ।
নমস্যন্তশ্চ মাং ভক্ত্যা নিত্যযুক্তা উপাসতে ॥”

পুরাণ সকল বাদের সমাহার; যে বাদের অনুকূল বচন চাহিবে, উহাতে তাহাই পাইবে। পুরাণকে বাছিয়া গোছাইয়া পড়ার নিয়ম নাই বলিয়া, পুরাণ লইয়া অনেক সময়ে অনেক গোল ঠেকে। তাই পূর্ব্বে নিয়ম ছিল, পুঁথি লইয়া পুরাণ পাঠ করিবে না, পুরাণ ব্যাখ্যাতার মুখে বা ব্যাসের মুখেই শুনিতে হয়। অথবা পুঁথি পাঠ করিতে হইলে, গুরুমুখ করিয়া পড়িতে হইবে। অর্থাৎ গুরুকে সম্মুখে রাখিয়া পুরাণ পাঠ করিতে হইবে, যেখানে সন্দেহ হইবে, সংশয় জন্মিবে সেইখানে প্রশ্ন করিবে, গুরু সন্দেহ নিরসন করিবেন, সংশয়ের সমাধান করিবেন। শিষ্যের কর্ত্তব্য গুরুকে পুরাণ পড়িয়া শুনান; গুরুর কর্ত্তব্য শিষ্যকে পুরাণের গূঢ় অর্থ বুঝাইয়া দেওয়া।

সাধারণ লোকের বিশ্বাস যে, পুরাণ বেদব্যাসের রচিত। অথচ বচন

আছে—"ব্যাসাদি মুনিভিঃ রচিতং"—কোন্ ব্যাস যে তাহারও নির্দ্দেশ নাই। কাশীর পণ্ডিতদিগের মধ্যে অনেকের মুখে শুনিয়াছি যে, শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রেই কান্তাবাণীর রচনা করিতে পারেন। বঙ্গবাসীর শাস্ত্রপ্রকাশ বিভাগে দেখিয়াছি ৺ বীর নৃসিংহ শাস্ত্রী পুঁথির বচন পড়িতে না পারিলেই স্বয়ং সেই স্থানে দুইটা বা দশটা অনুষ্টুপছন্দের শ্লোক রচিয়া দিতেন। আগে বটতলার প্রকাশকগণের অধীনে অনেক কবি ও পণ্ডিত থাকিতেন, যাঁহারা আদেশমত পুরাণ রচিয়া দিতে পারিতেন। কাশীতে ডাক্তার ব্যালেণ্টাইনকে একখানা গোটা ভবিষ্যপুরাণ নূতন করিয়া রচিয়া দেওয়া হইয়াছিল। কাশ্মীরেও এইভাবে দুই একখানা উপপুরাণ গত পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে রচিত হইয়াছে। ইহা দোষের নহে; আসল খাঁটি হিন্দু ইহাতে চটেন না। তাঁহারা দেখেন শাস্ত্র-সিদ্ধান্তসকল যথারীতি সরল প্রাঞ্জল ভাবে ব্যাখ্যাত হইয়াছে কি না। সিদ্ধান্ত বাক্যের বিশদ ব্যাখ্যা থাকিলেই, পুরাণের লক্ষণযুক্ত হইলেই যে কেহই লিখুক না কেন, হিন্দু সমাজ তেমন পুরাণ শুনিতে বা তাহাকে পুরাণ বলিয়া মান্য করিতে কোন দ্বিধা বোধ করেন না।

বৎসর খানেক পূর্ব্বে ইতালীয় মহাকবি দান্তের (Dante) কাব্যালোচনা করিতে যাইয়া আমি বলিয়াছিলাম দান্তের মহাকাব্য কতকটা আমাদের পুরাণের ধরণে লেখা। দান্তের মহাকাব্য সংস্কৃতে ভাবান্তরিত হইলে ঠিক একখানি উচ্চাঙ্গের খৃষ্টপুরাণ হইয়া দাঁড়ায়। ইউরোপের আর কোন দেশের মহাকবির মহাকাব্য সংস্কৃত পুরাণের আদর্শের এতটা অনুকূল নহে। পুরাণের ভাষা আবার স্বতন্ত্র। উহার শব্দযোজনা-পদ্ধতি, উহার শব্দের দ্যোতনা সাধারণ সংস্কৃত মহাকাব্য অপেক্ষা পৃথক। দান্তের, সেক্ষপীয়রের, মিল্টনের যেমন lexicon আছে, তেমনি প্রত্যেক পুরাণের ব্যাখ্যার স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র পদ্ধতি আছে। সে পদ্ধতি ত্যাগ করিলে পুরাণ ঠিকমত বুঝা যায় না। ধরণী কথকের সময় পর্য্যন্ত আমাদের দেশের কথকগণ রামায়ণ,

মহাভারত, ভাগবত এবং বিষ্ণুপুরাণের ব্যাখ্যা-পদ্ধতি জানিতেন। ৺মদন গোপাল গোস্বামী মহাশয়ের ভাগবত ব্যাখ্যা যে শুনিয়াছে, সেই জানে তাঁহার ব্যাখ্যা-পদ্ধতি স্বতন্ত্র ছিল। এসকল পদ্ধতি গুরুপরম্পরায় মুখে মুখে প্রচলিত ছিল। এখন প্রায় লোপ পাইয়াছে। স্বামী বিশুদ্ধানন্দ বলিতেন যে, আমাদের সংস্কৃত ভাষা কল্পলতিকা, যাহার যেমন অভিলাষ তেমনই অর্থ উহা হইতে সে বাহির করিতে পারে। তবে গুরু-মুখ-শ্রুত অর্থই গ্রাহ্য, কারণ সে অর্থ সিদ্ধ সাধকের মস্তিষ্ক-প্রতিভাত। আমি জানি মদনগোপাল গোস্বামী মহাশয় যখন ভাগবতের কোন শ্লোকের অর্থ মনোমত করিতে পারিতেন না, তখন তিনি উপবাস করিয়া, ধর্ণা দেওয়ার মত, নারায়ণের মন্দিরের সম্মুখে পড়িয়া থাকিতেন। কখনও কখনও দুই তিন দিন একভাবে কাটিয়া যাইত, তাহার পর প্রত্যাদিষ্টের মতন উঠিয়া তিনি হাসিতে হাসিতে শ্লোকের ব্যাখ্যা করিতেন এবং সমন্বয় সাধন করিতেন। এই ভাবে হত্যা দিয়া পড়িয়া থাকিয়া শাস্ত্রার্থ বাহির করিবার পদ্ধতি রামানুজাচার্য্যের সময় হইতে এদেশে প্রচলিত আছে।

পুরাণের আখ্যায়িকা-উপাখ্যান সকলের কতটুকু গ্রাহ্য এবং কতটুকু অবহেলার যোগ্য তাহার বিধিও নির্দ্দিষ্ট ছিল। লীলা আখ্যান যাহা, তাহার রস গ্রহণ করিতে হয়, ঘটনার দিকে দৃষ্টি রাখিতে নাই। কোন্ লীলায় কোন্ রসের উন্মেষ ঘটিতেছে, কেবল তাহারই বিচার করিতে হয়, ঘটনা লইয়া আলোচনা করিতে নাই। যাহা ইতিহাসের উপাখ্যান তাহার ঘটনার দিকে দৃষ্টি রাখিতে হয়; যেমন হরিশ্চন্দ্রের উপাখ্যান, নলোপাখ্যান ইত্যাদি। কারণ ঐতিহাসিক উপাখ্যানে ঘটনার দ্বারা চরিত্রের উন্মেষ সাধিত হয়; সুতরাং সেক্ষেত্রে ঘটনাই মুখ্য। যাহা অর্থবাদের আখ্যায়িকা তাহা কিসের রোচক, কোন তত্ত্বের প্রকাশক, তাহা বুঝিতে পারিলেই হইল। পুরাণ সত্যমিথ্যা লইয়া চিন্তিত নহেন; পুরাণের কেবল দৃষ্টি সিদ্ধান্তের দিকে, রসোন্মেষের দিকে, তথ্যনির্ণ-

য়ের দিকে। হিষ্ট্রীর সত্য পুরাণের সত্য নহে। বুদ্ধের জাতক সকল বৌদ্ধের পুরাণ। কোন কোন ইংরেজ ও জর্ম্মণ পণ্ডিত বলেন যে, বুদ্ধের জাতকের অনুকরণেই পুরাণের সৃষ্টি। রামায়ণ মহাভারতের ইতিহাস-কথার যে কত পরিবর্ত্তন এবং পরিবর্দ্ধন ঘটি-য়াছে তাহা প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌মাত্রেই জানেন। ভাসের নাটকগুলি পাঠ করিলেও মনে হয় না যে, আধুনিক মহাভারত ভাসের সময়ে প্রচ-লিত ছিল। কালিদাসের সময় হইতে বা তাহার কিছু পূর্ব্ব হইতে কবিগুরু বাল্মীকির নাম শুনিতে পাওয়া যায়। জাতকে যে রাম-সীতার কথা আছে তাহাও অদ্ভুত ও উৎকট। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ পুরাণগুলিকে বেজায় আধুনিক বলিয়া মনে করেন। কোন কোন পুরাণ খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমে লিখিত বলিয়া বহু পণ্ডিতের অনুমান। সে যাহা হউক, পুরাণ হিন্দুসমাজের আলেখ্য। পুরাণ বুঝিতে পারিলে ভারতবর্ষের হিন্দু জাতির আদর্শের কথা কতকটা জানা যায়। কি উপায়ে আমরা আমাদের জাতীয় বিশিষ্টতা কতকটা রক্ষা করিতে পারিয়াছিলাম, তাহাও পুরাণপাঠ করিলে বুঝা যায়। পুরাণ যেন পদে পদে জাতির বিশিষ্টতায় তালি দিয়াছে, যেন উহার উন্মেষ সাধনে নানা উদাহরণের সাহায্যে ব্যস্ত হইয়াছে। পুরাণ পড়িলেই মনে হয় নাস্তিকতার অপসারণ জন্য পুরাণকার প্রাণপণ যত্ন করিতেছেন। শৈব, শাক্ত, বৈষ্ণব—যে কোন সম্প্রদায়ের পুরাণ খুলিয়া পাঠ করুন না, দেখিবেন পুরাণ-কার নানা প্রকারের গল্পগাছা করিয়া, নানা দার্শনিক সিদ্ধান্তের অবতারণা করিয়া ঈশ্বরের অস্তিত্ব, ব্যাপ্তৃত্ব, নৃত্ব প্রতিষ্ঠাপিত করি-তেছেন। যেন মনে হয়, একটা বিশাল নাস্তিকতার ঢেউ সমাজের উপর দিয়া বহিয়া গিয়াছে, তাহার ফলে সমাজ-অঙ্গনে বিলাসের ও অবিশ্বাসের পলিমাটি জমিয়া গিয়াছে; পুরাণ তাহাই পরিষ্কার করিবার জন্য সদা ব্যস্ত।

পুরাণ লোকশিক্ষার গ্রন্থ, সমাজ-শাসনেরও গ্রন্থ। পুরাণে প্রধা-

নতঃ এই কয়টি বিষয়ের বিশেষ আলোচনা আছে ;—(১) ঈশ্বরে বিশ্বাস, সে ঈশ্বর সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্বান্তরাত্মা হইলেও আমা ছাড়া—সাধক ছাড়া স্বতন্ত্র পদার্থ, সাধ্য ও সাধকের বিভেদ বিচার সকল পুরাণেই স্পষ্ট করিয়া করা হইয়াছে। (২) একনিষ্ঠা,—যখন যে ভাবে যে দেবতার উপাসনা করিব, তখন তিনিই আমার সর্ব্বস্ব, তিনিই শ্রেষ্ঠ, তিনিই সর্ব্বশক্তিমান, সর্ব্ব দুঃখ ও পাপ-হর, সাধকের দৃষ্টিতে তখন তাঁহার অপেক্ষা বড় কেহ নাই। একনিষ্ঠা হইল উপাসনার মহাপ্রাণ ; যে উপাসক সেই একনিষ্ঠ সাধক। (৩) ঈশ্বরে মনুষ্যত্বের আরোপ ; তন্ত্র ও ভক্তিশাস্ত্র এই কথাটা স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন। সাধক যখন মানুষ, সাধকের ঈশ্বরও তখন মানুষ ; সাধকের একাদশ আসক্তি ও ষড়রিপু লইয়া তাহার ইষ্টদেবতার সৃষ্টি। সাধকের সাধ মিটাইবার জন্য ইষ্টদেবতার উন্মেষ ; সুতরাং সাধক যেমন, সাধকের ঈশ্বরও তেমনই হইবেন। এই মানবতাবাদ পুরাণে ওতপ্রোত ভাবে বিরাজিত। (৪) ঈশ্বরে—ইষ্টদেবতায় সাধকের সর্ব্বস্ব নিবেদন ;—প্রবৃত্তির মুখে সর্ব্বস্ব নিবেদন, নিবৃত্তির মুখেও সর্ব্বস্ব নিবেদন। প্রবৃত্তির মুখে সর্ব্বস্ব নিবেদনের তত্ত্বটা শ্রীসম্প্রদায়ের আচার্য্যগণ অতি সুন্দর ভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। আমার ঘর-সংসার, ধন-দৌলত, পুত্র-পরিবার সকলই আমার ইষ্টদেবতার, আমি কেবল তাঁহার প্রসাদভোজী মাত্র। আমি যাহা করিব, সে সকলের ফলাফল ঈশ্বরকে নিবেদন করিয়া করিব। ইহ সংসারে আমি যেন তাঁহার নায়েব, তাঁহার গোমস্তা, তাঁহার ইসারায়, তাঁহার ইঙ্গিতে আমি অর্থোপার্জ্জন করিতেছি, ঘরবাড়ী করিতেছি। নিবৃত্তির মুখে সর্ব্বসমর্পণের তত্ত্ব গীতায় পরিষ্কার করিয়া বুঝান আছে। প্রবৃত্তির ধর্ম্ম সকাম, কিন্তু সে কামনা ঈশ্বর সেবায় বিনিযুক্ত ; নিবৃত্তির ধর্ম্ম নিষ্কাম, কেননা আমার কর্ম্মের ফলাফল আমি ঈশ্বরে সমর্পণ করিয়াছি। এই দুইটি তত্ত্ব পুরাণ নানাবিধ উদাহরণের দ্বারা বুঝাইয়াছেন। (৫) সমাজ-ধর্ম্ম বা সমাজ-শরীরের ধর্ম্ম কেমন হওয়া

উচিত, তাহার ব্যাখ্যা। ব্যষ্টি বা ব্যক্তিকে কেমন করিয়া গড়িয়া তুলিলে, কেমন রাজা, কেমন প্রজা হইলে, কেমন পিতা কেমন পুত্র, কেমন পতি কেমন পত্নী হইলে সমাজের ঔজ্জ্বল্য সাধন হয় তাহার ব্যাখ্যা। এই সম্বন্ধে কথা কহিতে যাইয়া পুরাণ নানা যুগের সমাজের নানা অবস্থার কথা তুলিয়াছেন। সমাজের কোন পর্য্যায়ের কোন কথা, তাহা বুঝিতে পারিলে, পুরাণের ভিতরের কথা অনেকটা বুঝা যায়। (৬) ফলশ্রুতি,—কোন্ কর্ম্মের কেমন ফল, কি অবস্থায় কোন্ কার্য্যের ফল কিরূপ আকার ধারণ করে তাহার বিশ্লেষণ। এই বিষয়েই পুরাণের বিশিষ্টতা ফুটিয়া উঠিয়াছে। ইহা ছাড়া পুরাণের তিনটা স্তর আছে—ঐতিহাসিক, সামাজিক এবং সাধনার স্তর। ঐতিহাসিক স্তরটা দৃষ্টান্তের হিসাবে প্রযুক্ত; সামাজিক স্তর বিশ্লেষণপ্রধান; সাধনার স্তর ফলশ্রুতিপ্রধান। কোন্ সাধনার কি ফল, তাহা এক একটা আখ্যায়িকার সাহায্যে দেখান হইয়াছে।

পুরাণ বুঝিতে হইলে কি ভাবে পুরাণ পড়িতে হইবে, মোটামুটি তাহারই গোটাকয়েক কথা আহরণ করিয়া পাঠকগণকে দিলাম। আমার সঙ্কলিত সিদ্ধান্তের যথার্থতা সপ্রমাণ করিতে হইলে এক-একটি পুরাণ ধরিয়া আলোচনা করিতে হয়। আপাততঃ তাহার প্রয়োজনাভাব। কারণ, পুরাণপাঠের নিষ্ঠা সমাজে প্রকাশ না হইলে, সে পরিশ্রম ব্যর্থ হইবে। কাজেই এ বিষয়ের এই খানেই পরিসমাপ্তি করিলাম। পুরাণ যে এলোমেলো ব্যাপার নহে, তাহা বোধ হয় এই তিনটা প্রবন্ধে স্পষ্ট করিতে পারিয়াছি। পুরাণ পাঠের জন্যও বিশেষ যোগ্যতা অর্জ্জন করিতে হয়।

শ্রীপাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়।

বৃন্দাবন

বৃন্দাবনের কথা লিখিবার জন্য পুনরায় আমার উপর আদেশ হইয়াছে। ইহাতে আমি বিশেষ গৌরব অনুভব করিতেছি, কিন্তু ইহাতে 'নারায়ণের' গৌরব বৃদ্ধি হইবে কি না, সে বিষয়ে আমার যথেষ্ট সন্দেহ আছে। কিন্তু সে কথা বলিয়া অব্যাহতি লাভের কোনই সম্ভাবনা নাই ; সুতরাং আমাকে লিখিতেই হইতেছে। অতএব, 'নারায়ণের' পাঠকপাঠিকাগণের মনোযোগ ভিক্ষা করিয়া আমি কথা আরম্ভ করিলাম। এবার আর গৌরচন্দ্রিকা করিয়াই অর্দ্ধেক সময় অতিবাহিত করিব না। ইহা শুনিয়া কেহ যদি মনে করেন যে, আমি আগাগোড়া জ্ঞাতব্য কথারই অবতারণা করিব, তাহা হইলে তিনি যে ভুল বুঝিয়াছেন, সে কথা বুঝিতে তাঁহার অধিক বিলম্ব হইবে না।

আমি যে সময়ের কথা বলিতেছি, তাহার পর বহু বৎসর চলিয়া গিয়াছে। এখন হয় ত বৃন্দাবনের অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে, অনেক পুরাতন জিনিস অদৃশ্য হইয়াছে, তাহাদের স্থানে হয় ত অনেক নূতন দৃশ্য মস্তক উন্নত করিয়া দণ্ডায়মান হইয়াছে। কিন্তু তাহাতে আমার কোন ক্ষতি-বৃদ্ধি নাই। আমি বৃন্দাবনের ইতিহাস লিখিতে বসি নাই ; অথবা স্পষ্ট করিয়াই বলি, আমি আজকালকার হিসাবে ভ্রমণ-বৃত্তান্তও লিখিতেছি না। আমি আমারই কথা লিখিতেছি,—আমি যাহা দেখিয়াছিলাম, যাহা অনুভব করিয়াছিলাম, যাহা পাইয়াছিলাম, তাহাই লিপিবদ্ধ করিতেছি। আমি নোটবুক হাতে করিয়া বৃন্দাবনে যাই নাই ; বৃন্দাবনের কোন্ মন্দিরটা কত উচ্চ, কোন্ মন্দিরের বয়স কত, কোন্ মন্দিরের কারুকার্য্য কোন্ শ্রেণীর, এসকল তথ্য সংগ্রহ করিবার জন্যও আমি সেখানে যাই নাই। পূর্ব্বকালের ইতিহাস বা প্রত্নতত্ত্ব সংগ্রহ করিবারও গৌরবময় উদ্দেশ্য আমার ছিল না। আমি গিয়াছিলাম বৃন্দাবন দেখিতে,—তোমাদের ভূগোলে লিখিত বৃন্দাবন

দেখিবার অভিপ্রায় আমার ছিল না ; আমি মন্দির বা মন্দিরে স্থাপিত বিগ্রহ দেখিবার জন্যও যাই নাই। আমি যাহা দেখিতে গিয়াছিলাম, যাহা শুনিতে গিয়াছিলাম, তাহার কথা কি বলিয়া বুঝাইব ? আমি গিয়াছিলাম শুনিতে—

"রাধানামে সাধা বাঁশী
তেমনই ক'রে বাজে কি না ?
(জয় রাধে শ্রীরাধে ব'লে)"

আমি গিয়াছিলাম বৃন্দাবনে দেখিতে—

"যমুনা-কুঞ্জতটে বংশীবটে সে মাধুরী।
তারে চিন্‌তে নারি, নর কি নারী, সুন্দর কি সুন্দরী।"

আমি গিয়াছিলাম দেখিতে

"রাই নাচে বাঁশীর স্বনে, কৃষ্ণ নাচে রাধার সনে,
পবন হিল্লোলে দোলে পীতাম্বর নীলাম্বরী।"

আমি গিয়াছিলাম শুনিবার জন্য—

"এই, হিয়া দগ্‌দগি, পরাণ পুড়নি
কি দিলে হইবে ভাল।"

বৃন্দাবনে যাইয়া আমার এ সাধ, এ আকাঙ্ক্ষা মিটিয়াছিল কি ? আমি যাহা দেখিবার জন্য গিয়াছিলাম, যাহা শুনিবার জন্য গিয়াছিলাম, তাহা কি দেখিয়াছি ? তাহা কি শুনিয়াছি ? সে শুভাদৃষ্ট হইলে আজ এমন করিয়া শুষ্ক হৃদয়ে বেড়াইতে হইত না, এমন করিয়া পথে পথে ঘুরিতে হইত না, এমন করিয়া নরক-যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইত না।—সে কথা থাকুক, যাহা বলিতে বসিয়াছি, তাহাই বলি।

পাঠকপাঠিকাগণের হয় ত মনে আছে যে, আমি বৃন্দাবনে যাইয়া এক দিনের আধ ঘণ্টার পরিচিত পথিককে বহুদিনের পরিচিত বন্ধু-রূপে পাইয়া কৃতার্থ হইয়াছিলাম। অজ্ঞাতসারে সেই বন্ধুর আশ্রমেই অতিথি হইয়াই বুঝিয়াছিলাম, বনে জঙ্গলে, দুর্গম হিমালয়ের মধ্যে

যে মঙ্গলময় বিধাতা আমার আশ্রয় মিলাইয়া দিয়া আসিয়াছেন, তিনিই আজ আমার হস্তধারণ পূর্ব্বক এই বাবাজির আশ্রমে পৌঁছাইয়া দিয়া গেলেন। তবুও অন্ধ আমরা বলি "কৈ তুমি, কোথায় তুমি নারায়ণ!" তবুও সন্দেহ, তবুও তাঁহার মঙ্গলময়ত্বে অবিশ্বাস!

বাবাজি আমাকে পাইয়া যে কি করিবেন, কোথায় বসাইবেন, তাহাই ভাবিয়া পাইলেন না; তাঁহার আনন্দ যেন উছলিয়া পড়িতে লাগিল। আধ ঘণ্টার সামান্য পরিচিত পথিককে পাইয়া এত আনন্দ প্রকাশ করিতে আর কাহাকেও দেখি নাই। তিনি একে ডাকিতেছেন, ওকে বলিতেছেন;—আমি ত অবাক্। এদিক ওদিক যান, আবার দৌড়িয়া আসিয়া একই কথা বলেন, "শ্যামসুন্দর আজ কৃপা করিয়া এমন অতিথি মিলাইয়া দিয়াছেন।" আমি বলিলাম, "আমাকে পাইয়া আপনি যে শ্যামসুন্দরের সেবা ভুলিতে চলিলেন!" তিনি বালকের ন্যায় 'হাঃ হাঃ' করিয়া হাসিয়া বলিলেন, "আজ যে আমার ঘরে বাহিরে শ্যামসুন্দর।" বাবাজির ব্যবহারে, তাঁহার বৈষ্ণবোচিত সরলতায় আমি একেবারে মুগ্ধ হইয়া গেলাম; বুঝিলাম, ইহারই নাম 'তৃণাদপি সুনীচেন', ইহারই নাম 'অমানীনা মান দেন'। একজন প্রকৃত বৈষ্ণব দর্শন করিয়া কৃতার্থ হইলাম; এমন সাধুসঙ্গলাভে পবিত্র হইলাম।

যথাসময়ে স্নান করিয়া শ্যামসুন্দরের প্রসাদ পাইলাম। যমুনায় স্নান করিতে যাইতে চাহিয়াছিলাম, বাবাজি যাইতে দিলেন না; বলিলেন, "এত রৌদ্রে বাহির হইয়া কাজ নাই।"

রাত্রিতে ষ্টেশনে ও রেলগাড়ীতে নিদ্রা হয় নাই বলিলেই হয়। তাই আহারান্তেই শয়ন করিলাম; তাহার পর নিদ্রা। যখন নিদ্রাভঙ্গ হইল, তখন অপরাহ্ন পাঁচটা বাজিয়া গিয়াছে। তাড়াতাড়ি বাহিরে আসিয়া দেখি বাবাজি ভাগবত পাঠ করিতেছেন, আর আট দশজন স্ত্রীপুরুষ তাঁহার আশে পাশে সম্মুখে বসিয়া একাগ্রমনে শ্রবণ করিতেছেন। আমাকে দেখিয়াই আশ্রমেরই অপর এক বাবাজি

আমার উপবেশনের জন্য একখানি আসন আনিয়া দিলেন। আমি আসনখানি সরাইয়া রাখিয়া মৃত্তিকাসনেই বসিয়া পড়িলাম। বাবাজি অতি সরল ভাষায় ভাগবতের শ্লোকের ব্যাখ্যা করিতেছিলেন। দেখিলাম বাবাজি শুধু ভক্তই নহেন, তিনি মহাপণ্ডিত; গভীর শাস্ত্রজ্ঞানের সহিত অচলা ভক্তি সম্মিলিত হইয়া বৈষ্ণবপ্রবরকে বড়ই মিষ্ট করিয়া তুলিয়াছে।

প্রায় আধ ঘণ্টার উপর তাঁহার ভাগবতপাঠ শুনিলাম। তাহার পরই তিনি পাঠ বন্ধ করিয়া বলিলেন, "আজ এই স্থানেই শেষ করি। গৃহে অতিথি আছেন; তাঁহাকে দর্শন করাইতে লইয়া যাইতে হইবে।" এই কথা শুনিয়া আমি অতি বিনীত ভাবে বলিলাম, "আমার জন্য পাঠ বন্ধ করিবেন কেন? শ্রীধাম ত পলাইবার বস্তু নহে; আজই দেখিবার এত তাড়াতাড়ি কি? আর যাহা দেখিবার, যাহা শুনিবার, তাহা ত এখানেই দেখিতে শুনিতে পাইতেছি। আপনি পাঠ করুন।" তিনি সে কথা শুনিলেন না, আসন হইতে গাত্রোত্থান করিলেন। আমি বলিলাম, "আমার জন্য আপনি ব্যস্ত হইতেছেন কেন? যাইতে হয় ত আমি একেলাই যাইব। আপনি এসব ফেলিয়া আমাকে লইয়াই ব্যস্ত হইবেন না। ইহাতে যে আমার অপরাধ হইতেছে।" বাবাজি হাসিয়া বলিলেন, "নরসেবাই নারায়ণের সেবা। বাহিরের সুন্দরদের সেবা করিলেই শ্যামসুন্দরের সেবা হয়। ভুলিবেন না নরই নারায়ণ! হরি-দাসের সেবা না করিলে হরিসেবা হয় না।" হায় বাবাজি! যদি শ্রীহরির দাসই হইতে পারিতাম, তাহা হইলে এমন করিয়া পথে পথে বেড়াইতাম না—তাহা হইলে এমন করিয়া বাঁধনের উপর বাঁধন আঁটিতাম না। কিন্তু তখন আর সে কথা বলিবার অবকাশ পাইলাম না;—দ্বারের বাহিরে গাড়ী দাঁড়াইবার শব্দ শুনিয়াই বাবাজি তাড়াতাড়ি বাহিরে চলিয়া গেলেন।

একটু পরেই আমার সেই মথুরার সঙ্গী যুবকটিকে সঙ্গে লইয়া বাবাজি আশ্রম্-প্রাঙ্গণে উপস্থিত হইলেন এবং সহাস্যবদনে বলি-

লেন, "এই দেখুন, আপনার ভক্ত বন্ধু ব্রজনন্দন প্রসাদ আসিয়াছেন কথাটা বলিতে লজ্জা নাই যে, যিনি এত যত্ন করিয়া আমাকে সঙ্গে লইয়া আসিয়াছিলেন, যাঁহার সহিত সমস্ত রাত্রি রেলে কাটাইয়া আসিয়াছি, ইংরাজি আদবকায়দার খাতিরে তাঁহার নামটি জিজ্ঞাসা করিতে পারি নাই। এই রকম শিষ্টাচারই আমরা শিখিয়াছি! বাবাজির কথায় জানিতে পারিলাম যে, আমার যুবক বন্ধুটির নাম ব্রজনন্দন প্রসাদ! আমি তাঁহাকে দেখিয়াই বলিলাম, "আপনি এত তাড়াতাড়িই যে এলেন? আপনার মাতাঠাকুরাণী কেমন আছেন?" যুবক বলিলেন, "তিনি ভালই আছেন। আপনার ত আসিতে কোন অসুবিধা হয় নাই? এখানে ত কোন কষ্ট হইতেছে না?" আমি বলিলাম, "আপনি যাঁহার কাছে আমাকে পাঠাইয়াছেন, তিনি যে আমার পূর্ব্বপরিচিত বন্ধু।" বাবাজি তখন হাসিয়া বলিলেন, "প্রসাদ, তোমারই জন্য আমার এই বন্ধুদর্শন হইল।" প্রসাদ বলিলেন, "বাবুজিকে তাঁহার সম্পূর্ণ অপরিচিত ব্যক্তির নিকট পাঠাইয়াছি বলিয়া বাবা মা আমাকে কত অনুযোগ করিতে লাগিলেন এবং তাঁহাকে আমাদের বাড়ীতে লইয়া যাইবার জন্য তাড়াতাড়ি আমাকে পাঠাইয়া দিলেন।"

বাবাজি বলিলেন, "প্রসাদ, তাহা হইতেছে না; আমি ইঁহাকে শীঘ্র ছাড়িতে পারিব না।"

তখন দুইজনে অনেক কথা কাটাকাটি, অনেক রহস্যালাপ হইয়া স্থির হইল যে, সেদিন আমি বাবাজির আশ্রমেই থাকিব, পরদিন অপরাহ্নকালে মথুরায় যাইব।

আমি আর এতক্ষণ কিছু বলি নাই; যখন তাঁহাদের ব্যবস্থা ঠিক হইয়া গেল, তখন বলিলাম, "তাহা হইলে হে যুবক অক্রূর, আপনি কা'ল রথ লইয়া আসিবেন, আমি বৃন্দাবন আঁধার করিয়া মথুরায় চলিয়া যাইব।" আমার এই কথা শুনিয়া সকলেই হাস্য করিয়া উঠিলেন।

বাবাজি তখন বলিলেন, "প্রসাদ, তুমি তাহা হইলে ইঁহাকে একবার দেখাইয়া শুনাইয়া আন।"

প্রসাদ বলিলেন, "আপনিই বলিয়া দিন, কোথায় কোথায় ইঁহাকে লইয়া যাইব।" বাবাজি উত্তর করিবার পূর্ব্বেই আমি বলিলাম, "আগে ত যমুনা দর্শন করি; তাহার পর অন্য কথা।"

বাবাজি এই কথা শুনিয়া বলিলেন, "তাহা হইলে প্রথমে যমুনাই দেখাও; তাহার পর গোবিন্দজির মন্দিরে লইয়া যাইও।"

যুবক তখন আমাকে সঙ্গে লইয়া যমুনাতীরে গেলেন। লালাবাবুর মন্দিরের সম্মুখ দিয়া আমরা যমুনাতীরে গমন করিলাম। কিন্তু কৈ, সে যমুনা কৈ?

"যার বিমল তটে রূপের হাটে বিকাত নীলকান্তমণি"

সে যমুনা কৈ? এ যে একটা মরা নদী। এ নদীর অপর পারে যে দিগন্তবিস্তৃত বালুকারাশি, এ নদীর সামান্য জলরাশি যে ধীরে ধীরে বহিয়া যাইতেছে! আমি যে যমুনা দেখিতে আসিয়াছি, এ ত সে যমুনা নহে; এ যমুনার তীরে ত কিশোর কিশোরীর মধুর প্রেমাভিনয় হয় নাই; এ যমুনা ত শ্যামের বাঁশী শুনিয়া উজান বহিতে পারে না, এ যমুনা ত প্রেমের হিল্লোলে নাচে না। আমি প্রসাদকে বলিলাম, "আমি এ যমুনা দেখিতে চাহি না।" প্রসাদ বলিল, "এই ত যমুনা, দোসরা আর যমুনা নাই।" আমি বলিলাম, "এই যদি যমুনা হয়, তাহা হইলে আমার দেখা শেষ হইয়াছে; এখন চলুন বাবাজির আশ্রমে যাই।"

প্রসাদ বলিলেন, "গোবিন্দজির মন্দির, আর আর মন্দির দেখিবেন না? এখনও ত কিছুই দেখা হয় নাই।"

আমি বলিলাম, "কিছুই দেখা হয় নাই; কিছু যে দেখা হইবে, তাহাও ত মনে হয় না। যেমন করিয়া দেখিতে হয়, যে সাধনফলে বৃন্দাবন দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা আমার নাই। আমি বৃথা

এখানে আসিয়াছি। তবে যখন আসিয়াছি, তখন সহরটাই দেখিয়া লই; বৃন্দাবনদর্শন আমার অদৃষ্টে নাই।"

প্রসাদ বলিলেন, "তাহা হইলে এখন কোথায় যাইবেন?"

আমি বলিলাম, "সহর দেখিগে চলুন।" এই বলিয়া প্রসাদের সঙ্গে অগ্রসর হইলাম।

এখন তাহা হইলে সহরের কথাই বলি, কারণ সেদিন আমি সহরই দেখিয়াছিলাম। সহরে দেখিয়াছিলাম অসংখ্য মন্দির আর অগণিত বানর। আমি সেদিনের বৃত্তান্ত বলিতে হইলে, তাহাই বলিব। তাহার পর আর কিছু বলিতে পারিব না—বৃন্দাবনের কথা বলিতে পারিব না। যাঁহারা বৃন্দাবন প্রকৃতপক্ষে দেখিয়াছেন, তাঁহাদের কথাই শুনিবেন—আমার কথা নহে; যাঁহারা বৃন্দাবনের স্বরূপ উপলব্ধি করিয়াছেন, যাঁহারা বৃন্দাবনচন্দ্রের শ্রীমুখ দর্শন করিতে পারিয়াছিলেন, তাঁহাদের বর্ণনা পাঠ করুন—ভক্তের বৃন্দাবন মানসচক্ষে দেখিতে পাইবেন। আমি দেখিয়াছিলাম বড় ছোট মন্দির, আমি সেদিন দেখিয়াছিলাম অসংখ্য ভালমন্দ নরনারী, আর আমি দেখিয়াছিলাম বানর। ইহার অধিক আমি দেখিও নাই, বলিতেও পারিব না। আমার কাছে মন্দিরের বৃত্তান্ত শুনুন—বানরের কথা শুনুন।

শ্রীগোবিন্দজির মন্দির—শুনিলাম এই মন্দির নাকি বৃন্দাবনের অন্য সকল মন্দির অপেক্ষা উচ্চ ছিল; এত উচ্চ ছিল যে সুদূর দিল্লী হইতেও এই মন্দিরের অগ্রভাগ দেখিতে পাওয়া যাইত। আর মন্দিরের কারুকার্য্যও অতি সুন্দর ছিল। সাধক যেখানে যাহা উৎকৃষ্ট, যাহা মহার্ঘ পাইয়াছিলেন, তাহাই তাঁহার ইষ্টদেবতার মন্দিরে লাগাইয়াছিলেন। সে মন্দিরের ভগ্নাবশেষ এখনও রহিয়াছে। মুসলমান বাদশাহ আওরঙ্গজেব নিজের মস্তক অপেক্ষা আর কাহারও মস্তক উন্নত দেখিতে পারিতেন না; বিশেষতঃ যেখানে সেখানেই যে হিন্দুর দেবমন্দির সকল মস্তক উন্নত করিয়া সগর্বে দণ্ডায়মান থাকিয়া

হিন্দুধর্ম্মের জয় ঘোষণা করিবে, স্বধর্ম্মে একনিষ্ঠ মোগল বাদসাহ তাহা সহ্য করিতে পারেন নাই। তাই তিনি কাশী প্রভৃতি অনেক স্থানের দেবমন্দিরের উচ্চ চূড়া ভাঙ্গিয়া দিয়াছিলেন; শ্রীগোবিন্দজির মন্দিরের সেই অভ্রভেদী চূড়াও তাঁহার দৃষ্টি অতিক্রম করিতে পারে নাই—তিনি এই মন্দিরের চূড়াও ধূলায় লুণ্ঠিত করিয়াছিলেন। তাহার পর হইতে শ্রীগোবিন্দজি পুরাতন মন্দিরের পশ্চিমদিকে একটা গলির মধ্যে আর একটি মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন এবং এখনও সেখা-নেই বিরাজ করিতেছেন। এই গোবিন্দজি বহুকাল পূর্ব্বে বনের মধ্যে লুক্কায়িত ছিলেন। গাভীসকল বনে বিচরণ করিবার সময় সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া গোবিন্দজিকে দুগ্ধ পান করাইয়া আসিত। পরে ভক্ত-প্রবর রূপ ও সনাতন যখন বিষয়-বাসনা পরিত্যাগপূর্ব্বক "কোথায় কৃষ্ণ, কোথায় কৃষ্ণ" বলিতে বলিতে পাগলের মত ছুটিয়া বৃন্দাবনে উপস্থিত হন, তখন তাঁহারা স্বপ্নাদেশ প্রাপ্ত হইয়া শ্রীগোবিন্দ-জিকে বনের মধ্য হইতে তুলিয়া আনিয়া বৃন্দাবনে প্রতিষ্ঠিত করেন।

শেঠের মন্দির—এখন যদি মন্দির দেখিতে হয়, তবে সে শেঠের মন্দির। দেখিবার মত মন্দিব বটে! অর্থে যদি দেবতার কৃপা লাভ করা যায়, লক্ষমুদ্রা ব্যয় করিয়া নানা কারুকার্য্য-শোভিত মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়া যদি মোক্ষলাভ করা যায়, তাহা হইলে ধন-কুবের লক্ষীচাঁদ শেঠ মহাশয় তাহা লাভ করিয়াছেন। ১২৬৩ সালে এই সুন্দর মন্দির নির্ম্মিত হইয়া শ্রীরঙ্গজিদেবের প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছিল এবং যেখানে যা সাজে, অর্থব্যয় করিয়া মন্দিরকে যত-দূর সৌন্দর্য্যবিভূষিত করা যাইতে পারে তাহার ত্রুটি হয় নাই—শেঠজির ধনাগার তাহার জন্য উন্মুক্ত হইয়াছিল। প্রকাণ্ড মন্দির, প্রকাণ্ড চত্বর, প্রকাণ্ড প্রাচীর, বিস্তৃত সরোবর, দীর্ঘকায় সোনার তালগাছ, অসংখ্য দাসদাসী, অগণ্য সেবাইত, প্রশস্ত অতিথিশালা—আর প্রচুর ভোগের আয়োজন! ভোগী কিন্তু নির্লিপ্ত! দেবতা নানা বস্ত্রালঙ্কারে বিভূষিত হইয়া নীরব, নিস্পন্দ, নিশ্চল! ঐশ্বর্য্যের

মধ্যে দেবতা ঢাকা পড়িয়া গিয়াছেন। আমার মত অভাজন মন্দির দেখিয়া বলিল, "হাঁ, মন্দির বটে !" দেবতা! দেবতা! কোথায় তুমি ?

এই দুইটি মন্দির দেখিয়াই সেদিনের মত বাবাজির আশ্রমে ফিরিয়া আসিলাম; ব্রজনন্দন প্রসাদ মথুরায় চলিয়া গেলেন।

বিশ্রামের পর বাবাজির শ্যামসুন্দরের মন্দিরের বারান্দায় বাবাজির নিকট উপবেশন করিলাম। তিনি বলিলেন, "আজ কি কি দেখিলেন ?" আমি বলিলাম, "মন্দির আর বানর।" বাবাজি আমার কথা বুঝিতে পারিলেন। তিনি বলিলেন, "মন্দির এখানে অনেক আছে, বানরও অনেক, কোন নরের সাক্ষাৎ কি পাইলেন না ?" আমি বলিলাম, "বাহিরে ত এখনও পাইলাম না—এই আশ্রমে অবশ্য পাইয়াছি। বাহিরে সবাই আমারই গোষ্ঠী।" বাবাজি হাসিয়া বলিলেন, "যমুনা দর্শন হইয়াছে কি ?" আমি বলিলাম, "যমুনা দর্শন হয় নাই, তবে একটা নদী দেখিয়াছি।"

এইবার বাবাজির মুখ গম্ভীর হইল। তিনি অতি ধীর স্বরে বলি-লেন, "ভাই, বৃন্দাবন দেখিবার জন্য, যমুনা দেখিবার জন্য সব ছাড়িয়া এখানে আসিয়া পড়িয়া আছি; কিন্তু আমারও কিছুই দর্শন হইল না। শ্যামসুন্দরের কাছে প্রতিদিন ঐ প্রার্থনাই ত করিয়া থাকি; ঐ কথাই ত জপ করিয়া থাকি। কিছুতেই কিছু হয় না ভাই! কিছুই হয় না! এ জীবন এমনই করিয়া কাটিয়া যাইবে। এখনও যে অহঙ্কার আছে—এখনও যে বাসনা আছে।" এই বলিয়াই বাবাজি তাঁহার মধুর কণ্ঠে গান ধরিলেন—

"ওরে, জটিলা কুটীলা আমার বাসনা।
আমি, ভজন পূজন কি করিব, নাম সাধনই হোলো না।
আমি মনেতে করি, গৃহ সাধন-বৈরী,
বনে যাব, নাম করিব দিবাসর্ব্বরী;
ওরে, বাসনা থাকিলে মনে বনে গেলেও যন্ত্রণা।"

বাবাজি প্রাণের আবেগে উল্টাইয়া পাল্টাইয়া বারবার এই গানটি তন্ময় হইয়া গাহিতে লাগিলেন। আর আমি—আমি চুপ করিয়া বসিয়া তাঁহার এই ভাবোন্মত্ততা দেখিতে লাগিলাম। আর তখন মনে হইতে লাগিল ;—এই বিদ্বান পণ্ডিত সদ্বংশজাত ভদ্রলোক সংসার ছাড়িয়া, সব ত্যাগ করিয়া যে বৃন্দাবন দর্শন করিবার জন্য এখানে আসিয়া পড়িয়া আছেন, দিনরাত তাঁহার ইষ্টদেবতা শ্যামসুন্দরের কাছে বৃন্দাবন-দর্শন ভিক্ষা করিতেছেন ; তিনিই যখন কাতর, তাঁহার আশাই যখন এখন পর্য্যন্তও মিটিল না ; তখন আমি কামনার দাস, বাসনার গোলাম, ধনমান যশঃ পিপাসু,—আমি কোথাকার কে ? সাধন নাই, ভজন নাই—মুক্তি লাভের প্রয়াসী ; ঢাল নাই তলোয়ার নাই—নিধিরাম সর্দ্দার !

গান শেষ হইয়া গেলে বাবাজি বলিলেন, "ভায়া, তোমাকে আর 'আপনি' বলিয়া সম্বোধন করিতে পারিতেছি না—তুমি বলিলে সখ্য ভাবের আভাস পাই। এখন জলযোগ কর, তাহার পর চল দুই-জনে একটু বেড়াইয়া আসি। বেশ জ্যোৎস্না উঠিয়াছে—কি বল ?" আমি বলিলাম, "আমার কোন আপত্তি নাই, এখনই চলুন না।" তিনি বলিলেন, "চল এখনই যাই, ফিরিয়া আসিয়া শ্যামসুন্দর যাহা মিলাইয়া দেন, তাহাই জলযোগ করা যাইবে।"

তখন পৃথিবী জ্যোৎস্নায় ভরিয়া গিয়াছে ; আকাশের চাঁদ দুই হাতে তৃষিত তাপিত নরনারীর মস্তকে অমৃত ঢালিয়া দিতেছেন। চারিদিকে প্রকৃতি নিস্তব্ধ ! সমস্ত সহর যেন পবিত্র জ্যোৎস্নার ধারায় অভিষিক্ত হইতেছে। এমনই সময়ে বাবাজির সহিত আমি ব্রজের পথে বাহির হইলাম। বাবাজির গমনের ধরণ দেখিয়া বুঝিলাম, তিনি কোন বিশেষ স্থানের কথা মনে করিয়া বাহির হন নাই। আমাকে যে কি দেখাইতে লইয়া যাইতেছেন, তাহাও বুঝিতে পারিলাম না। তাঁহার সঙ্গেই চলিতে লাগিলাম।

কিছু দূর যাইয়াই একটি পরিত্যক্ত মন্দির দেখিতে পাইলাম।

সেখানে লোক-সমাগম নাই। বাবাজি সেই ভগ্ন পরিত্যক্ত মন্দিরের সোপানে উপবেশন করিলেন এবং ইঙ্গিতে আমাকে তাঁহার পার্শ্বে বসিতে বলিলেন। আমি তাঁহার পার্শ্বে উপবিষ্ট হইলাম; একটি কথাও বলিলাম না।

তিনি তখন আপন মনে, আপনার ভাবে মত্ত হইয়া প্রথমে গুন্ গুন্ করিয়া গান করিতে লাগিলেন। তাহার পর স্বর স্পষ্ট হইল। এতদিন পরেও বাবাজির সে গানটি আমার মনে আছে; সেই রাত্রির দৃশ্য এখনও আমি স্পষ্ট দেখিতে পাইতেছি। বাবাজি সুকণ্ঠ; তিনি ভক্তিপূর্ণ হৃদয়ে গাহিতে লাগিলেন—

জা লাগি চাঁদন বিখ তহ ভেল
চাঁদ অনল জা লাগি রে।
জা ল্যাগি দখিন পবন ভেল সায়ক
মদন বৈরী জা লাগি রে।
সে কাহ্নু কতে দিনে পাহুন
হসি ন নিহারসি তাহি রে।
হৃদয়ক হার হঠে টারহ জনু
পেম সুধা অবগাহি রে।
রোয়ইতে মোরে আতুর ভেল লোচন
রয়নি জাম জুগে গেলি রে।
কজ্জল চিকুর চীর নহি চেতএ
হার ভার তনু ভেল রে।
তপ তোর তরুণ করুণে কাহ্নু আএল
কাঁই বঢ়া বসি মান রে।
জেও ন অছল মন সেও ভেল সংপন
কবি বিদ্যাপতি ভনে রে।

গানের সকল কথা মূর্খ আমি বুঝিতে পারিলাম না; তবুও বুঝিলাম, বাবাজি গাহিতেছেন—যার জন্য চন্দন বিষ হইল, যার জন্য চন্দ্র অগ্নি হইল, যার জন্য মলয় পবন শর হইল, যার জন্য মদন শত্রু হইল, সেই কানাই কত দিন পরে তোর ঘরে আসিয়াছে, সহাস্যমুখে তাহাকে দেখিস্ না? তোর তপফলে কানাই আসিল। বিদ্যাপতি বলিতেছে, যাহা মনেও ছিল না, তাহাও সম্পন্ন হইল। গানটা আমি এই রকমই বুঝিয়াছিলাম। কিন্তু বুঝিলাম না, বাবাজির কি হইল? সত্য সত্যই কি এতদিন পরে তিনি তাঁহার প্রাণ-কানাইয়ের দর্শন লাভ করিলেন। বাবাজি এই গান গাহিতে লাগিলেন, আর তাঁহার নয়নদ্বয় হইতে অশ্রু প্রবাহিত হইয়া তাঁহার বক্ষস্থল প্লাবিত করিতে লাগিল। পাষাণ-হৃদয় আমি, অবাক্ হইয়া এই দৃশ্য দেখিতে লাগিলাম, আর অতৃপ্ত হৃদয়ে এই গান শুনিতে লাগিলাম। বাবাজি তাঁহার শ্যামসুন্দরকে হৃদয়-আসনে বসাইয়া প্রেমানন্দে তন্ময় হইয়া গেলেন, আর আমি শূন্য-হৃদয়ে তাঁহার পার্শ্বে বসিয়া রহিলাম। মাথার উপর চাঁদ হাসিতে লাগিল; আমার মনে হইল, আমাকে যেন বলিতেছে—এই সম্বল লইয়া বৃন্দাবনে আসিয়াছ?

শ্রীজলধর সেন।

জীবন পণে

(কথা-নাট্য)

প্রথম দৃশ্য।

[হিমালয়ের উপত্যকা প্রদেশ, ঘন শালবন, দূরে দূরে ভূর্জ্জবৃক্ষ, মাঝে মাঝে বন্য ধুতুরার গাছ, কোথাও বা শ্বেতমল্লিকার সারি। গাছে গাছে লতায় পাতায় ঘন নিবিষ্ট, তাহার মধ্যে কুটীর। মাঝে মাঝে মেঘেরা কুটীরটিকে ঢাকিয়া দিতেছে। কুটীর-দ্বারে বসিয়া বাঁশুলিয়া বাঁশী বাজাইতেছে। বাঁশীর সুরের সঙ্গে সঙ্গে দূরস্থিত বাঁশঝাড়ের পাতার শব্দ ও বুলবুলের ডাক শোনা যাইতেছে। বাঁশুলিয়ার সর্ব্বাঙ্গে ছাইমাখা, পরিধানে ছিন্ন মলিন বস্ত্র, মাথার চুলগুলি রুক্ষ, কপালের উপর লতাইয়া পড়িয়াছে—হাওয়ায় মাঝে মাঝে সরিয়া পড়িতেছে। বাঁশুলিয়ার দীর্ঘ উন্নত সবল দেহ, চক্ষু সুন্দর পদ্মপলাশের মত ঢল ঢল বিস্তৃত। বাঁশুলিয়া একমনে বাঁশী বাজাইতেছে। বেলা অপরাহ্ন—শুষ্ক শালপাতা মাড়াইয়া রাজকুমারী মনিকার সখি কাঞ্চনার প্রবেশ। কাঞ্চনার কৃষক রমণীর বেশ।]

কা। বাঁশুলিয়া! আমি এসেছি!

বাঁ। (অন্যমনস্কভাবে বাঁশীতে তান তুলিতেছিল)—

কা। মর্ মিন্‌সে, নিশ্চয় পাগল! রাজকুমারীর যে কি বুদ্ধি তা জানিনে। বাঁশুলিয়া! অ বাঁশুলিয়া! এমন পাগলের তানে মানুষে মজে?

[একটা হরিণ ছুটিয়া আসিয়া কুটীর-দ্বারে নয়ন তুলিয়া বাঁশীর সুর উদ্‌গ্রীব উৎকর্ণ হইয়া শুনিতে লাগিল। বাঁশুলিয়াও তাহার বাঁশী পূর্ব্ববৎ ফু' দিয়া বাজাইতে লাগিল।]

কা। বাঁশুলিয়া! অ বাঁশুলিয়া!—মরণ দশা আর কি? মিন্‌সে কালা নাকি,—শুন্‌তে পাওনা? অ বাঁশুলিয়া!

বাঁ। অ্যাঁ! অ্যাঁ! (বাঁশুলিয়ার মুখ লাল হইয়া গেল)—কে? কাঞ্চনা!

কা। আমি রাজকুমারীর কাছ থেকে এসেছি, রাজকুমারী মাথার দিব্য দিয়েছে, তোমাকে একবার দেখা কর্‌তে হবে।

বাঁ। কে? কাঞ্চনা? রাজকুমারী, কে? আমি ত বুঝ্‌তে পাচ্ছি না।

কা। (স্বগতঃ) মিন্‌সে যেন ন্যাকা! (প্রকাশ্যে) রাজা শঙ্করজিতের কন্যা কুমারী মণিকা।

বাঁ। কাঞ্চনা! আমার অপরাধ ক্ষমা কর্‌তে ব'ল। আমি গরীব, চাষ করে খাই, রাজকুমারী জান্‌লে আমি তাঁকে আমার কুটীরে বাঁশীর গান শোনাতাম্ না। রাজকুমারী জান্‌লে আমি তাঁকে হৃদয়ের সে বুকভরা পুরোণো রাগিণী শোনাতাম্ না। আমার মর্ম্ম ভেঙ্গে গেছে কাঞ্চনা, আমার মর্ম্ম ভেঙ্গে গেছে। যাও যাও, রাজকন্যা, রাজার সখী তাঁরা আমার কুঁড়েতে কেন? আমি কোন রাজকুমারীকে চিনিনা, আমি শুধু একজনকে মণিকা বলে জানতাম্। সে ত ওই পাহাড়ের কেল্লার ধারে কি গ্রাম আছে, সেইখানে থাকে, এই জানি,—রাজকন্যাকে জানি না। মণিকা! মণিকা! সে ত সেই গাঁয়ের মণিকা!

কা। বাঁশুলিয়া, রাজকুমারীর বিবাহ! বুঝ্‌লে?

বাঁ। তা আমি চাষ করি, বাঁশী বাজাই, আমার কি—আমার কি—তাঁর বিয়েতে কি আমাকে বাঁশী বাজাবার জন্য ডেকেছেন? রাজকন্যার বিয়েতে আমি কেন? আমি কেন? বিয়েতে বাজাবার বাঁশী ত আমার নেই।

কা। শোন বাঁশুলিয়া, রাজকুমারী মণিকা তোমায় একটী কথা স্মরণ করে দিতে বলেছেন,—শ্রাবণ সন্ধ্যায় অরণ্যপথে দুর্জ্জয়

লিঙ্গের মন্দির হ'তে ফির্বার সময় ভল্লুকের মুখ হ'তে যাকে রক্ষা করেছিলে, যার প্রাণ আজ তোমারই দান, যাকে বুকে করে শ্রাবণের অবিশ্রান্ত ঝর্ঝর ধারায় ভিজ্তে ভিজ্তে দুর্গ-তলে পৌঁছে দিছ্লে, তিনি তোমার কাছে আজ তাঁর ধর্ম্মরক্ষা করতে বলেছেন। আর বলেছেন, একদিন প্রাণরক্ষা করেছেন, আজ ধর্ম্মরক্ষা করুন। তিনি নারী, তিনি আর কি কর্তে পারেন ? সবই পরবশে, আত্মবশে কেবল প্রাণ, তাও তাঁরি চরণে ফেলে দিয়েছেন। শুধু তাই দিতে পারেন তাঁকে।— বাঁশুলিয়া, নারী-ধর্ম্ম রক্ষা কর।

বাঁ। কাঞ্চনা! আমায় ক্ষমা কর। আমি জানতাম্ না যে, তিনি রাজা শঙ্করজিতের কন্যা, আমি জানতাম্ না যে রাজকন্যা এই দরিদ্রের জন্য কেন সে কথা এখনও মনে করে রেখেছেন, তাঁকে আমার কথা ভুলে যেতে ব'ল ; বনপথে, পথ হারিয়েছিলেন, আমি বুন কাঠুরিয়া, আমি তাই—তা সে কথা আবার মনে রাখারাখি কেন ?

কা। বাঁশুলিয়া! মনের ধর্ম্ম মনই জানে। নারী ভালবাসে, কেন ভালবাসে তা সে জানে না! বাঁশুলিয়া! এই যে হরিণী তোমার বাঁশীর স্বর শুনে উভরায় ধেয়ে এল, কেন বাঁশুলিয়া ?— এই যে বুলবুল গাইছে, এই যে তোমার কুঁড়ের দ্বারের কাছে গোলাপ দুলে দুলে ফুটে উঠ্ছে, কেন বল ত ? বাঁশুলিয়া! ওরা কি জানে কেন ? ফুল কেন ফোটে বল্তে পার, বাঁশুলিয়া ?

বাঁ। আমি ত ফুল নই, ফুলের ভাষা—কথা বল্ব কি ক'রে বল। আমি মানুষ, মানুষের কথা দুটো কইতে পারি। ফুল ফোটে কেন, তা আমি কি জানি। কাঞ্চনা, আগে জান্লে আমি তাঁকে গান শোনাতাম্ না ; আগে জান্লে আমি তাঁকে—

কা। চুপ কর্লে কেন বাঁশুলিয়া, তাঁকে কি ? বল—বল—

বাঁ। কিছু নয়, কাঞ্চনা, যাও, যাও, রাজকন্যার দূতী হ'য়ে আমার কাছে কেন ? আমি—যাও, যাও, কিছু জানি না, আমি ওসব কিছু জানি না—দেখ আমি জানি ছেঁড়া কাপড়ে সারাদিন পরের ক্ষেতে মাথার ঘাম পায়ে ফেলে পেট ভরাতে হয়। কেউ ডেকে কাজ দেয় ত কাজ করি, আজ কেউ ডাকে নি, আজ আর কাজ করতে যাই নি, আজ সারাদিনটা বাঁশীই বাজাচ্ছি। আমার কাছে এসব কথা কেন কাঞ্চনা—যাও, যাও, আমায় কেন তাঁর কথা শোনাতে এসেছ। রাজার বিয়ের বাজাবার বাঁশী আমার নেই! আমি অনাথ, রাস্তায় পড়ে থাকতুম, গাছের পাতা ঘাস খেয়ে মানুষ হ'য়েছি। আজ একটা পাখী কি ফল মুখে করে এনে ফেলেছিল, তাই খেয়ে দিন কেটেছে। আমার কথায় রাজকুমারীর কি কাজ ? কাঞ্চনা, যাও যাও, শীগ্‌গির যাও, আমি রাজকুমারীকে চিনি নি; যাও, যাও, ওসব কথা এখানে ব'ল না। ওই শোন বনদেবী জেগে উঠেছে —গোল ক'র না, যাও যাও—ওই দেখ এলা লতার মুকুট দুলে উঠ্‌ছে, সরে যাও, যাও!

কা। বাঁশুলিয়া! বাঁশুলিয়া! কি বলছ বাঁশুলিয়া? তুমি কি বুঝ্‌তে পাচ্ছ না যে, তোমার জন্যই শুধু রাজকুমারী মণিকা পরাণ ধরে রেখেছে,—পিতার ভৎর্সনা, মাতার স্নেহের অভিমান, সখীদের টিটকারী, এ সকল সহ্য করে শুধু তোমার মুখ চেয়ে আছে,—শুধু তোমার একটা কথায় আজ তাঁর বাঁচা মরা নির্ভর করছে,—নইলে হিমালয়ের মেয়ে মরতে ভয় পায় না। তুমি মানুষ না পাষাণস্বরূপ বাঁশুলিয়া, পাষাণও বোধ করি ফেটে যায়, তুমি বেশ নিশ্চিন্ত উত্তর দিলে। না না, তুমি নিতান্ত কাপুরুষ, ধিক্ ধিক্! না হলে এই মুহূর্তে এই অন্ধকারে দুর্ভেদ্য শালবন ভেদ করে তোমার প্রিয়তমাকে উদ্ধার করে আনতে। বাঁশুলিয়া! তোমায় শেষ কথা বলে যাই,

তুমি ধর্ম্মরক্ষা করলে না, কিন্তু নারী হিমালয়ের কন্যা, সে ধর্ম্ম রক্ষা করতে জানে। তুমি প্রাণ ভয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে রইলে, নারী প্রাণের মায়া করে না, জেন, সে নিজেই সে ধর্ম্ম রক্ষা করবে। বাঁশুলিয়া! রাজকুমারীর কাল বিবাহ! (বাঁশুলিয়ার হাত হইতে বাঁশী পড়িয়া গেল) হায়! বাঁশুলিয়া, যদি বুঝতে নারীর প্রাণ! (স্বগতঃ) পুরুষের আঁখির পাতে কি আছে, যায় এমন হয়—উন্মাদ! তোমার সে বোধশক্তি লোপ হয়ে গেছে।

[কাঞ্চনা রাগভরে যে পথ দিয়া আসিয়াছিল, সেই পথ দিয়া প্রস্থান করিল। দূরে নেপথ্যে গান গাহিয়া উঠিল।—

বাঁশীর তানে বনে এনে এখন কেন নিদয় হও,
এমন নিঠুর তুমি চরণতলে দলে যাও।—

একখানা মেঘ আসিয়া কুটীরকে ছাইয়া ফেলিল। বাঁশুলিয়া দূরে অচল মেরুর পানে চাহিয়া রহিল।]

বাঁ। (অন্যমনস্ক হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া)—বাঁশী—না আমি, বাঁশীই নিঠুর, সেই আমার মর্ম্ম ভেঙ্গেছে। বাঁশী? না আমি!

[হরিণটা তখন বাঁশুলিয়ার কাছে আসিয়া তাহার গায়ের কাছে মাথাটা ঘসিতে লাগিল। চারিদিকে ঝিঁঝিঁ ঝঙ্কার করিতেছে—বাঁশুলিয়া বাঁশী লইয়া আবার বাজাইতে লাগিল—]

বাঁ। (হঠাৎ বাঁশী ফেলিয়া) না না কাঞ্চনা, তুমি ঠিক বলেছ, ঠিক বলেছ, আমি কাপুরুষ—না না মণিকা, বাঁশুলিয়াও ধর্ম্ম রক্ষা করতে জানে—মণিকা! মণিকা! (বাঁশুলিয়া চঞ্চল চরণে এদিক ওদিক করিতে লাগিল) "তুমি ধর্ম্মরক্ষা করলে না, কিন্তু নারী ধর্ম্মরক্ষা করতে জানে।" (হাসিতে হাসিতে) হাহা-হাহা! নারী সকলই জানে, পুরুষে জানে না, সে অত মনের ধর্ম্ম ত বোঝে না—ঠিক—কাঞ্চনা! ঠিক বলে গেছ। আচ্ছা বাঁশুলিয়া! সে তোর কে? তোর ত এই

ছেঁড়া টেনা পরা, ঝর্‌ঝরে এই পাতার কুঁড়ে, তায় তুষার পড়্‌ছে ঝরে—মেঘের রাজ্যে বাস, আর ঘাস কেটে খাস্—সম্বল ত এই নিষ্ঠুর বাঁশী, যে কেবলই কাঁদে—চাঁদের আলোয় দেখা রাজকুমারীর হাসিতে চাহনিতে তোর এত কথা কেন ? ফুল ফোটে, পাখী গায়, মেঘ আসে চলে যায়, চাঁদ উঠে জ্যোছনা ঝরে, বাঁশ ঝাড়ে পাতা সর্ সর্ করে, তুই এই বাঁশী নিয়ে আছিস্ বাঁশী নিয়েই থাক্, যে যাবার সে যাক্, তোর এত কথা কেন ? উঁহু না, এ বুকের ভেতর আবার যেন কেউ কথা কইছে, কি বল্‌ছে, ধর্ম্মরক্ষা ! ধর্ম্মরক্ষা ! মণিকা ! মণিকা ! রাজকুমারী মণিকা, না—না শুধু মণিকা, বুকের ভেতরে কে যেন জাগিয়ে ঘুম ভাঙ্গিয়ে বল্‌ছে আমার মণিকা, ধর্ম্মরক্ষা ! ধর্ম্মরক্ষা ! বাঁশী ! এতদিন কি সুরে কাঁদ্‌ছিলে, আজ আবার অন্ধকারে কার রূপ মনে পড়ে জেগে উঠ্‌লে বাঁশী—আজ যেন কি বেসুর ঠেক্‌ছে, সুরের দিশে ঠিক করে্‌ত পাচ্ছিনি—কোথায় ! কোথায় ! রূপ ! রূপ ! জীবন ! জীবন ! না না ধর্ম্মরক্ষা ! একি সুরে বিশ্ব ভরে গেল, ধর্ম্মরক্ষা ! হিমালয়ের কন্যার ধর্ম্মরক্ষা, নারীর ধর্ম্মরক্ষা—পুরুষের ধর্ম্মরক্ষা !

[বাঁশুলিয়া ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল, হরিণটা সেই কুঁড়ের দ্বারের সম্মুখে শুইয়া পড়িল। পার্শ্বের সেই গোলাপ গাছ হইতে ফুলের পাপড়ি ঝরিয়া ঝরিয়া পড়িতে লাগিল।]

দ্বিতীয় দৃশ্য।

[হিমালয়ের বনদুর্গ—দুর্গাধিপ শঙ্করজিতের একমাত্র কন্যা মণিকা, দুর্গ-প্রাকারের সম্মুখে দাঁড়াইয়া একটি হাত অলিন্দের উপর, আর একটি হাত গালে দিয়া, দূরে সূর্য্যাস্তের পানে চাহিয়া রহিয়াছেন—সম্মুখে কাঞ্চনজঙ্ঘার বিরাট পাষাণ ও ধবলাগিরির অভ্রভেদী শীর্ষ তুষারে মণ্ডিত, স্বর্ণাভা-অঙ্কিত। একদিকে বনদুর্গ—শাল, তমাল,

পিয়াল ও ভূর্জ্জবৃক্ষের ছায়ায় ঢাকা, দূরে অন্ধকার ঘনাইয়া আসিতেছে। অন্যদিকে জ্যোতির্ম্ময় অগ্নিকণা পর্ব্বত শিখরে ঠিক্‌রিতেছে —সন্ধ্যাসূর্য্য রক্তময়। মণিকার অঞ্চল বাতাসে উড়িতেছে, পার্শ্বে একটি গোলাপ গাছে গোলাপফুল বাতাসে দুলিয়া দুলিয়া, মণিকার কপোলের কাছে আসিয়া পড়িতেছে; মণিকা সম্পূর্ণ অন্যমনস্ক, হুঁস নাই। দুর্গ-প্রাকারের নিম্নদেশ দিয়া পার্ব্বত্যপথে কৃষক রমণীগণ গ্রাম্য গান গাহিতে গাহিতে পৃষ্ঠে সন্তান ও শিরে বোঝা লইয়া চলিয়াছে—]

ঘরে ঘরে আছে আমার সেই মুখ,
আমার বড় দুখে সুখ,
খাটি সারাবেলা হেসে পড়ি ঢলে
হাসি বড় করে মুখ,—
আমার বড় দুখে সুখ।
মেঘের আঁচল দিয়ে ঘেরা
আমার কুঁড়ে ঘর,
সেথা পাগলা ঝোরা পাগল পারা
পড়্‌ছে ঝরর্‌ ঝর।
সেই শালের ছায়ায় জড়িয়ে লতা
বাঁধা সুখের ঘর—
আমার মনের মত দুখ,
আমার বড় দুখে সুখ।

ম। সন্ধ্যা নেমে এল, বুকের ভিতর যেন আঁধার গুম্‌রে উঠ্‌ছে— একি মেঘের ঘটা, এত মেঘ পাহাড়ে আসে কৈ এত কাল' মেঘ ত কখন দেখিনি, সে বিদ্যুৎ ও বজ্রপতনের দিনেও ত নয়! কোথা তুমি প্রাণাধিক! এ অন্তরে যে দীপখানি জ্বেলেছ, কৈ, বুঝি এ ঝঞ্ঝায় তা নিভে যায়, কোথা তুমি অন্তরতম! ইচ্ছা হচ্ছে ঐ ফিঙের মতন গাইতে গাইতে উড়ে যাই—

ঐ কেমন ঘুঘু ছুটি পাতার আড়ালে মুখোমুখী করে ব'সে আছে, এ মেঘের অন্ধকারে তাদের কোন ভয়ই নেই—ঐ যে ওরা কেমন গাইতে গাইতে চলেছে—প্রাণাধিক! প্রাণাধিক! এ প্রাণ যে তোমারই শরণ নিয়েছে, কেমন করে, কেমন করে ধর্ম্মরক্ষা হবে বল—

[কৃষক রমণীরা তখন গাইতে লাগিল,—

"আমার মনের মত দুখ

আমার বড় দুখে সুখ"—]

আহা! ওরা সব কেমন গাইছে, আমার বড় দুখে সুখ—কৈ তুমি, আমার প্রাণের সুন্দর! কি বাঁশীই বাজায়েছিলে, বাঁশুলিয়া! তুমিই আমার বড় দুখে সুখ। (একটা নিশাচর টিট্টিভ চীৎকার করিয়া উড়িয়া গেল—মণিকা চম্‌কাইয়া উঠিল)—কাঞ্চনা এখনও এল না কেন, ওদের ভেতর কাঞ্চনাকে দেখতে পাচ্ছি না, তবে কি সে যেতে পার্‌লে না, কেন আমি ত তাকে ওদের মত কাপড় প'রে দুর্গ হ'তে বার হ'তে দেখেছি—কি জানি, যদি দেখা না হয়, তিনি হয় ত কি মনে কর্‌ছেন, যদি কথা না কয়ে ফিরিয়ে দেন—তিনি হয় ত কি ভাবছেন, আমিই বুঝি ভুল কর্‌ছি—

কা। (গান গাহিতে গাহিতে নেপথ্যে—)

বাঁশীর তানে বনে এনে এখন কেন নিদয় হও,

এমন নিঠুর তুমি চরণ তলে দলে যাও।

বাঁশী তব কি গুণ জানে

আমি উতলা, সকল হেলা—

ধাই তোমা পানে,

তবু বল ফিরে যেতে, কেবা জানে কিবা চাও।

ম। কাঞ্চনা! কাঞ্চনারই গলা—"কেবা জানে কিবা চাও"—সত্যিই কে জানে কি যে চাই—

(কাঞ্চনার গান গাহিতে গাহিতে প্রবেশ—)

ম। কাঞ্চনা! কাঞ্চনা! গান রাখ্, কি উপায় হ'ল, এই এলি? তাঁকে বলেছিলি, বলেছিলি? আমি নারী কি কর্‌তে পারি, পারি শুধু এই প্রাণ দিতে, বলেছিলি; চুপ করে রইলি কেন, দেখা হয় নি? বল্, বল্ তোর পায়ে পড়ি কাঞ্চনা, অন্ধকার গুহার মত অন্ধ হয়ে আছি, বুকের ভেতর আঁধার জমাট্ বেঁধে আস্‌ছে, বুঝি শ্বাস আর পড়ে না। দেখা হ'য়েছিল, কাঞ্চনা! কাঞ্চনা!

কা। দাঁড়াও বাপু, হ্যাঁ, আমার পায়ে কাঁটায় ক্ষত বিক্ষত হ'য়ে গেল, আমি এখন মর্‌ছি আপনার জ্বালায়—

মণি। তা হোক্, দেখা হয়েছিল কি'না বল্, বল্ তোর পায়ে ধরি বল্—

কা। রস' বাপু, উহু, উঃ—বাবা!—হয়েছিল দেখা! রস'—হ্যাঁ!

মণি। হয়েছিল তবে, তারপর, তারপর তবে, তারপর বলেছিলি?

কা। সখি! সে কথা শোন্‌বার তোমার প্রয়োজন? সে কথা না শোনাই ভাল। উহুঃ মাগো পা'টা জ্বলে গেল, সে কি হেথায় গা!

মণি। কাঞ্চনা! তুই রাক্ষসী। বল্ বল্—তুই কি বুঝেও বুঝ্‌বি নি!

কা। সখি! বুঝি, বুঝি সে কথা না কওয়াই ভাল, বুঝি ভুল্‌তে পার্‌লেই সুখ, বুঝি না পাঠালে আরো ভাল হ'ত, কেন পাঠিয়েছিলে সখি! সে ত পাগল—

মণি। না কাঞ্চনা, তা ভোলবার যে নয়। কাঞ্চনা, সে আমার পাগল তার উপরে রাগ করিস্ নি। কাঞ্চনা, সবই আমার অদৃষ্ট, কাঞ্চনা! আমি কেন অম্‌নি ভিখারীর ঘরে জন্মালাম না, আমি কেন অম্‌নি ঘাস কি পাতা খেয়ে মানুষ হলাম্ না! না কাঞ্চনা! সে আমার জন্য পাগল! তিনি কি বল্‌লেন কাঞ্চনা, তুই সকল কথা তাঁকে জানিয়েছিলি?

কা। সখি! বিধি ভুল করে ফেলেছে সখি, তাই তোমায় এই রাজার ঘরে পাঠিয়েছে। তোমার পাগল কি বলে জান? বলে, আমি কাকেও চিনি নি, রাজকুমারী আবার কে? আমাকে দূর্ দূর্ করে তাড়িয়ে দিলে। বলে, চাষার আবার রাজকুমারীর সঙ্গে কি কাজ?

ম। কাঞ্চনা! সে অভিমান করেছে, সে অভিমান করেছে কাঞ্চনা! আমি প্রাণ ধরে তার ভাব বুকে করে বেড়াচ্ছি, কাঞ্চনা সে অভিমান করেছে, সে অভিমান করেছে, সে যে আমা-বই আর কাকেও জানে না কাঞ্চনা, তাই সে অভিমান করেছে।

কা। না গো না, সে রাজকুমারী মণিকাকে চেনে না। সে জানে ঐ পাহাড়ের তলায় গাঁয়ের একটা মেয়ে, তাকেই সে গান শুনিয়েছিল, রাজকুমারী জান্‌লে তাকে কখন বাঁশী শোনাত না। সে গরীব, পাতার কুঁড়েয় বাস করে। তায় দিবারাত্র তুষার পড়ে। বলে, রাজকুমারীতে আমার কি কাজ?

ম। কাঞ্চনা! আমি বুঝেছি কাঞ্চনা! রাজকুমারী একটা, মণিকা আর একটা কাঞ্চনা! সে ত আস্‌বে না কাঞ্চনা—তবে কি উপায় হবে কাঞ্চনা? অন্ধকার ঘনিয়ে গাঢ় হয়ে এল, কাঞ্চনা! এত অন্ধকার কখন দেখেছিস্? ওদিকে তুষার পড়্‌ছে। কাঞ্চনা, আমি একলা যাব, না কাঞ্চনা আমিই যাব। সে অভিমান করেছে কাঞ্চনা, আমিই যাব। রাজকুমারী ব'লে সে অভিমান করেছে, আমিই যাব। আর ত আমি রাজকুমারী নই কাঞ্চনা! বড় অন্ধকার, সেই শালবনের ভিতর দিয়ে কেমন করে—চারিদিকে দুর্গে যে সতর্ক পাহারা, না আমিই যাব,—আমিও ঐ কৃষক রমণীর বেশে যাব, আর ত আমি রাজকুমারী নই সখি! যাব আমিই যাব —শুনতে পাচ্ছিস্ নি, ঐ যে বাঁশী ডাক্‌ছে—আমিই যাব।

[দুর্গ-প্রাকারের একধারে রাজা শঙ্করজিৎ কোষবদ্ধ তরবারিতে

হস্ত দিয়া দাঁড়াইয়া—পার্শ্বে রাণী হৈমবতী দুই হাত বক্ষে চাপিয়া—উভয়ের কথাবার্ত্তা শুনিতেছিলেন, ক্রোধে তাঁহার স্ফুরিত অধর দংশন করিতে করিতে অগ্রসর হইয়া মণিকার সম্মুখে আসিয়া কহিলেন—]

শ। রাজকুমারী মণিকা! এ দুর্ভেদ্য পার্ব্বত্য অন্ধকারে তুষার-নিসিক্ত প্রস্তরকঙ্করময় বনপথে কার অভিসারে—কোথায় যেতে হবে? রাজকুমারী মণিকা! কৃষক রমণী হবার এতই সাধ, সে ছিন্নবস্ত্র মলিন রুক্ষকেশ বন্য বর্ব্বর ভিখারী পথের কুক্কুর পরান্ন উচ্ছিষ্টভোজী আশ্রয়হীনের আশ্রয় কি এতই প্রার্থনীয় ও মধুর?

ম। পিতা! এ বিস্তৃত আকাশতলে হিমালয় কাকেও আশ্রয়-হীন করেন না!

শ। চুপ্! কে তোর পিতা? পাপিয়সি! ক্ষত্রিয় ধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিলি, নারীধর্ম্মে ভস্ম লেপিলি, গৌরীশঙ্কর সম আমার এ বিজয় গরিমার তুঙ্গ শৃঙ্গ ধূলায় লুটালি? সেই ঘৃণিত লজ্জাহীনটা তোর আশ্রয়স্থল হ'ল? আরে, আরে—

ম। পিতা! স্বামী নিন্দা নারীর শুনতে নিষেধ!

শ। কি—কি—স্বামী? চুপ, নিজমুখে ও পাপ কথা উচ্চারণ করলি? তোর জিহ্বা শতধা হ'ল না? রাণী! এই তোমার গর্ভজাত কন্যা—যে আত্মমর্য্যাদা জানে না?

হৈম। মহারাজ! আমার কন্যা আমারই উপযুক্তা! মহারাজ! স্বামী-নিন্দা শুনতে নারীর নিষেধ—একথা ত সত্যই মহারাজ! মহারাজ! এই হিমালয়ই সে সত্যের অক্ষুণ্ণ ধারা গঙ্গা, নন্দা, সরযূ, গোমতী, তিস্তা যুগ যুগ ধরে নিয়ে চলেছে। মহারাজ! ঐ বিরাট গৌরীশঙ্করও তাই সাক্ষ্য দিচ্ছেন, সে কথা ত মিথ্যা নয় মহারাজ! আমার গর্ভজাত কন্যা আত্মমর্য্যাদা ভুলে নি রাজন্!

শ। বটে, বটে, ভুল হয়ে গেছে রাণী! বুঝ্‌তে ভুল হয়েছিল, ভুলে গিয়েছিলাম, একেবারে ভুলে গিয়েছিলাম। তোমার ত সব কাহিনীই স্মৃতিতে লেখা থাকে দেখ্‌ছি! তুমি কি বল্‌তে চাও যে দীনহীন কপর্দ্দকশূন্য নিঃস্ব অন্নমুষ্টির ভিখারী, পথে পথে ঘাস পাতা খেয়ে জীবনধারণ করে, সেই হতভাগ্য ঘৃণিত কুক্কুরেরও অধম—(মণিকা দুই হাত কর্ণে চাপা দিল)—তার করে আমি শঙ্করজিৎ দক্ষ প্রজাপতির বংশধর, আমার ঔরসজাত কন্যাকে—রাণী! রাণী! আমার মস্তিষ্কে বজ্রের দাহন জ্বালা—অজিৎ! অজিৎ! প্রহরী, ডাক অজিৎকে —আশ্চর্য্য! আশ্চর্য্য! আমারই কন্যা আজ আমারই ভাগ্যের নিয়ন্তা হোল, ধিক্!

[রাজা শঙ্করজিৎ সেইখানে পাদচারণা করিতে লাগিলেন। একবার কোষবদ্ধ তরবারির উপর হাত দিয়া, মণিকার মুখের দিকে চাহিলেন, আবার ঊর্দ্ধে আকাশপানে চাহিয়া চঞ্চলভাবে বেড়াইতে বেড়াইতে কহিলেন, "নারায়ণ!"—মণিকা ও কাঞ্চনা মুখ নত করিয়া চুপ করিয়া রহিল। রাণী হৈমবতী অঞ্চলে নয়নজল মুছিতে লাগিলেন।]

শ। নারায়ণ! নারায়ণ! হিমালয়! তুমি জান আমার বংশের গরিমা। হিমালয়! আজ সমস্ত বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড উপ্‌ড়ে ফেল্‌তে ইচ্ছা হচ্ছে—হো! হো! কি তাপ!

[অজিৎ প্রবেশ করিলেন—শ্বেতচম্পকবর্ণাভা ফুটিয়া উঠিতেছে —বিশাল বক্ষ বর্ম্মে আচ্ছাদিত, শিরে উষ্ণীষ—কটীতে তরবারি।]

শ। অজিৎ! অজিৎ! শোন, এই মণিকা ও সখী কাঞ্চনাকে কারাগারে—

হৈম। মহারাজ! বালিকা, মার্জ্জনা করুন—

শ। চুপ্—বাধা দিও না—উত্থিত বজ্রের নীচে আপনাকে এন' না, যাও, সর—এই মণিকা ও সখী কাঞ্চনাকে কারাগারে

নয়ে যাও। আর মন্ত্রীকে আমার আদেশ জানাও যে, রাজকুমারী মণিকার কাল বিবাহ! তুমিও প্রস্তুত হও, ভবিষ্যৎ সিংহাসন তোমারই—একথা যেন তোমার স্মরণ থাকে, কাল প্রাতে তোমার অভিষেক—তোমাকে আজীবন পুত্রবৎ স্নেহে পালন করেছি, আশা করি রাজাদেশ পালন করবে।

অ। মহারাজ! জিজ্ঞাসা করতে পারি—অপরাধ?

শ। আমার ইচ্ছা,—যাও, যাও আমার সম্মুখ থেকে নিয়ে যাও—জিজ্ঞাসা ক'র না—মনে হয় এ বিশ্ব কেন গুঁড়া হয়ে যাক্ না? যাও নিয়ে যাও—

অ। আসুন রাজকুমারী! সখী কাঞ্চনা সঙ্গে এস—

ম। মা গো—

[মণিকা ও কাঞ্চনা অজিতের সঙ্গে প্রস্থান করিলেন।]

হৈ। মহারাজ! আমার বালিকার অপরাধ মার্জ্জনা—

শ। রাণী হৈমবতী! তোমার ত সকল কাহিনীই মনে থাকে, আমার বংশের কাহিনীও তোমার মনে রাখা উচিত ছিল। আমিও এই হিমালয়ে দক্ষপ্রজাপতির বংশধর, সে কথাটাও তোমার মনে রাখা উচিত ছিল।

হৈ। মহারাজ! কন্যা আমার নিতান্ত বালিকা মাত্র, মহারাজেরও স্মরণ রাখা উচিত ছিল যে, দক্ষের যজ্ঞও এই একই কারণে ধ্বংস হয়েছিল—মহারাজ! আমার কন্যাকে মার্জ্জনা করুন! (শঙ্করজিতের পায়ের উপর আছড়াইয়া পড়িলেন) কন্যা আমার বালিকা মাত্র!

শ। (পা দিয়া ঠেলিয়া) রাজ্ঞী! আশ্বস্তা হও! (হাসিয়া) এ সমস্ত হিমালয়ে এমন কেউ নাই যে আমার এ যজ্ঞ ধ্বংস করে। আমার বংশের সম্মান, আমার বংশের সম্মান, আমার যথেষ্ট জ্ঞান আছে। যাও, যাও, সব—এই বৃদ্ধ বয়সে ভেবেছিলাম মণিকার উপযুক্ত পাত্র অজিতের করে তাকে সমর্পণ

করে গভীর অরণ্যে বানপ্রস্থ অবলম্বন করব। রাণী! আমার মস্তিষ্কে বজ্রের জ্বালা জ্বল্‌ছে। যাও, যাও, জানি আমি রমণীর অশ্রুজলই বল। হিমালয়! তুমি জান এ মরমের কথা। রাণী হৈমবতী! দ্বাদশ বর্ষ তপশ্চর্য্যা করে এই মণিকা কন্যা লাভ করেছিলে রাণী! শঙ্কর আমার বক্ষে বড় শক্ত হৃদ-পিণ্ড দিয়েছেন, না হ'লে এতক্ষণ দ্বিধা হয়ে যেত।

[রাজা শঙ্করজিৎ ঊর্দ্ধে অন্ধকার পানে তাকাইতে তাকাইতে নিশ্বাস ফেলিয়া চলিয়া গেলেন—রাণী! হৈমবতী মাটিতে পড়িয়া কাঁদিতে লাগিলেন। তখন মেঘ ঘনাইয়া আসিল, মুষলধারে বৃষ্টি, বজ্রপতনের শব্দ ও করকাবর্ষণ হইতে লাগিল।]

তৃতীয় দৃশ্য।

[রাত্রি অন্ধকার—পার্ব্বত্য দুর্গের অভ্যন্তর; অন্ধকার অন্তঃপুর-কারাগার, একপার্শ্বে জানালা—জানালার ধারে মণিকা দাঁড়াইয়া—পর্ব্বতের অপর পার্শ্ব হইতে চাঁদ উঠিল—চন্দ্রালোক তাঁহার মুখের উপর পড়িয়াছে—সিক্ত নয়নপল্লব জলে ভরা—চাঁদের পানে চাহিয়া—জানালার পার্শ্বে দেয়ালের ধার দিয়া অজিৎ আসিতেছিলেন—মণিকার কথা শুনিয়া দাঁড়াইলেন।]

ম। হে চন্দ্রমা! তুমি ত সব জান; তুমি, সেই অন্ধকার বন-পথে এমনি অকস্মাৎ পর্ব্বতের ফাঁক হতে উঁকি মারলে—সেই চন্দ্রালোকে দুজনের দেখা, সেই ভীষণ ভল্লুকের হাতে—সেই ভয়াল বন্যপশুকে রিক্ত হস্তে কেমন ক'রে নিহত ক'রে—সেই কপাটবক্ষ দৃঢ় উন্নতশীর্ষ পুরুষ,—তারপর তুমি কোথায় লুকালে, শ্রাবণ মেঘে ঝর্ঝর ধারা বর্ষণ আরম্ভ হ'ল। আহা প্রাণাধিক! আমায় বক্ষে ধরে দুর্গমধ্যে রেখে গেল—চন্দ্রমা! তুমিও মেঘের আড়ালে থেকে সবই দেখেছিলে—তুমি দক্ষযজ্ঞে সতীর দেহত্যাগ দেখেছিলে, তুমি এই

হিমালয়ে আবার কি তাই দেখ্‌তে চাও, চন্দ্রমা? তুমি ত কত যুগের কত হাসি, কত কান্না—

[অজিৎ ধীরে ধীরে দৃঢ়পদে সম্মুখে আসিয়া]

অ। রাজকুমারী!

ম। (নিরুত্তরে নিশ্বাস ফেলিলেন)—(স্বগতঃ) আঃ—সর্প কেন দংশিল না শিরে—

অ। রাজকুমারী! আপনাকে দুটো কথা শুধু বল্‌তে এসেছি—রাজকুমারী! আমি আপনার প্রণয়-পাত্রকে মিলন করাইয়া দিব, রাজকুমারী! বোধ হয় জানেন অজিৎসিংহ কখন মিথ্যা কথা বলে না; বালককাল হ'তে এক সঙ্গে খেলা, একসাথে মৃগয়া, একসাথে পর্ব্বতে পর্ব্বতে নন্দা তিস্তার উৎপত্তি-স্থান খুঁজিতে যাওয়া, একসাথে অনেকদিন কেটেছে—রাজকুমারী আমাকে তাঁর সহোদর ভায়ের মত মনে করবেন্ বোধ হয়।

ম। অজিৎ ভাই! (রাজকুমারী মণিকা কাঁদিয়া ফেলিলেন)—আমি আর রাজকুমারী নই!

অ। রাজকুমারী! আপনি আশ্বস্তা হ'ন,—কল্য বিবাহরাত্রে আমি প্রাণ দিয়েও আপনার প্রণয়-পাত্রকে মিলন করাইয়া দিব—শুধু এই কথা বল্‌তে, শুধু এইটুকু জানাতে এয়েছি;—আর—না থাক্—

[অজিৎ দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া চলিয়া গেলেন।]

ম। ভাই! ভাই! বুঝেছি বুঝেছি—প্রেম সর্ব্বত্যাগী, অজিৎসিংহ বুঝেছি—হায়! কেন এই নারীজন্ম!—আহা! আমার সে পাগল এখন কোথায়, এখন সে কি করছে?—বাঁশুলিয়া! বাঁশুলিয়া! কৈ সে তোমার বংশীধ্বনি—পাগল! পাগল! তুমি আমার হৃদয়ে কি বাঁশী বাজালে বল, কি রন্ধ্রে আমার এ হৃদয়ে আঘাত করলে, যায় সমস্ত তুষার গলে গেল,

পাগল! বাঁশুলিয়া! বাঁশুলিয়া! তুমি কি জান যে তোমার শালবনের বুন পাখী আজ কোন লোহার খাঁচায় আবদ্ধ হয়েছে?

চতুর্থ দৃশ্য।

[বিবাহরাত্রি—অচলমেরুর চারিদিকে আলোকমালা পর্ব্বতে পর্ব্বতে বাদ্য ও শঙ্খের রোল ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিতেছে—বিবাহ-মণ্ডপে সালঙ্কারা রাজকুমারী মণিকা, পার্শ্বে সখী কাঞ্চনা, সম্মুখে পুরোহিত মন্ত্র উচ্চারণ করিতেছেন—সম্মুখে হোমাগ্নি। একপার্শ্বে বসিয়া রাজা শঙ্কররঞ্জিৎ—দূরে রাণী হৈমবতী যোড়হস্তে উর্দ্ধপানে চাহিয়া—চারিদিকে প্রহরীবর্গ,—নিমন্ত্রিত আত্মীয়বর্গ সকলে উপবিষ্ট, কেহ হাসিতেছেন, কেহ কথা কহিতেছেন। পুরোহিতের পার্শ্বে শ্রুতিপাঠ হইতেছে।]

শ। রাণি! শুভকার্য্যে অশ্রুজল ফেল না,—রাণী হৈমবতী! তুমি কি আমার বংশ-গরিমার ভাতি ভুলে গেছ? কেন, তোমার ত সকল কাহিনীই মনে থাকে।

পু। (হোমাগ্নিতে হব্যদান করিলে অগ্নি আরও প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিল) মহারাজ! আহুতি গ্রহণ করুন—ওঁ শ্রীবিষ্ণু—

[নেপথ্যে বাঁশুলিয়ার বংশী বাজিয়া উঠিল—]

ম। কাঞ্চনা! কাঞ্চনা! (উন্মত্তার ন্যায় দাঁড়াইয়া) ঐ বাঁশী বেজেছে, তিনি আস্‌ছেন, তিনি আস্‌ছেন, কাঞ্চনা! কাঞ্চনা!

কা। বস বস—(মণিকা আবার বসিয়া পড়িলেন)

শ। ওকি! ওকি! হাঁ, এই যে—ওঁ শ্রীবিষ্ণু—

পু। কৈ বর কোথায়—বরকে আনয়ন করুন,

শ। অজিৎ! অজিৎ! কৈ মন্ত্রি! অজিৎকে শীঘ্র আনয়ন করুন, লগ্ন অতিবাহিত হয়ে যায়! ওকি! কৈ অজিৎ কোথায়?

[মন্ত্রী ছুটিয়া অজিৎকে ডাকিতে গেলেন—নেপথ্যে হর হর

শব্দ ও অশ্বের পদধ্বনিতে পার্ব্বত্য দুর্গ কম্পিত ও ধ্বনিত হইতে লাগিল।]

শ। কি! কি! কিসের গোলমাল! আরে! আরে! ভীরু সব—

[বাঁশুলিয়া ও বারজন পাহাড়িয়া অশ্বোপরি সশস্ত্রে প্রবেশ করিল—মুখে মার্—মার্—মার্—হর হর রব)—বাঁশুলিয়া বামহস্তে মণিকাকে ঘোড়ার উপর তুলিয়া লইল।]

ম। কাঞ্চনা! কাঞ্চনা! একি স্বপ্ন না বিভ্রম!

বাঁ। শোন, সকলে শোন, এই রাজকুমারী মণিকা আমার ধর্ম্ম-পত্নী, আমি বাঁশুলিয়া তাকে হৃদয় দিয়ে গ্রহণ করেছি—চন্দ্র সূর্য্য হিমালয় ও আমার আত্মা সাক্ষী। আমি এই সকলের মধ্যে থেকে তাঁকে গ্রহণ কর্‌লাম, যদি কাহারও সাধ্য থাকে সে যেন বাধা দেয়। দ্বিতীয় দক্ষপ্রজাপতি! আমিই তোমার যজ্ঞ ধ্বংস কর্‌লাম—

[ইতিমধ্যে পাহাড়িয়াগণের সহিত রাজা শঙ্করজিতের প্রহরীবর্গ ও অন্যান্য পুরবাসীগণের যুদ্ধ বাধিয়া গেল।]

শ। আরে রে বর্ব্বর! হতভাগ্য হীন ক্রীতদাস, ভিক্ষান্নে দিন কাটে যার, বধি তোরে পশুর মতন! প্রহরি! প্রহরি! রুদ্ধ কর সকল দুয়ার, যেন মক্ষিকা না পলায় চকিতে। আরে, আরে! ঘৃণিত তস্কর, বধি তোরে ছাগ পশু সম।

[বাঁশুলিয়া মণিকাকে লইয়া যুদ্ধ করিতে করিতে প্রস্থান,—রাজা শঙ্করজিৎ তার অনুধাবন করিলেন—]

হৈ। নারায়ণ! নারায়ণ! (মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন)—

[পাহাড়িয়ারাও যুদ্ধ করিতে করিতে বাহির হইয়া গেল—]

কা। সব ত বেশ হোল! এখন কাঞ্চনা তোকে ত কেউ চায় না? তুই তবে দাঁড়িয়ে কেন বল,—তোর ত কাজ ফুরল—এ

হোমাগ্নি কেন তবে আর শুধু জ্বলে—বাঁশুলিয়া! তুমি বেশ বাঁশী বাজিয়েছিলে—বাঃ।

[হোমাগ্নিতে ঝম্প প্রদান।]

পঞ্চম দৃশ্য।

[চারিদিকে অন্ধকার—তিস্তা নদীর তীরের নিকট দুই পর্ব্বতের মধ্যদিয়া পথ; দ্রুতবেগে বাঁশুলিয়া সর্ব্বাঙ্গ রক্তাক্ত ক্ষতবিক্ষত দেহে, মণিকাকে বক্ষে লইয়া ঘোড়ার উপর ছুটিয়া আসিতেছেন—]

বাঁ। মণিকা! মণিকা! ধর্ম্মরক্ষা হয়েছে, মণিকা! ধর্ম্মরক্ষা! ধর্ম্মরক্ষা!

ম। প্রিয়তম! প্রিয়তম!

বাঁ। বারটা পাহাড়িয়া মরে গেছে—তাদের সমস্ত বুকের রক্ত ঢেলে দিয়েছে—বারটা প্রাণের মূল্যে তোমায় আজ লাভ করেছি মণিকা!

[পশ্চাতে রাজা শঙ্করজিৎ ছুটিতে ছুটিতে আসিতেছেন—]

শ। নিস্তার নেই! নিস্তার নেই! এখন নিস্তার নেই! সারা বিশ্বে তোর স্থান হবে না, নিস্তার নেই! আরে! আরে! কৃতঘ্ন পিশাচ, মৃত্যু শিরে তোর—

[বাঁশুলিয়ার ঘোড়া তুষারের উপর পা মচ্‌কাইয়া পড়িয়া গেল, বাঁশুলিয়াও মণিকাকে লইয়া তিস্তার তীরে ছিট্‌কাইয়া পড়িলেন—ঠিক সেই সময়ে শঙ্করজিৎ—"এইবার! এইবার! না না পতিত যে"— এই বলিয়া একবার থম্‌কাইয়া দাঁড়াইলেন—পরমুহূর্ত্তেই মণিকা চকিতের মধ্যে বাঁশুলিয়ার তরবারি লইয়া শঙ্করজিতের গলে আঘাত করিলেন—তাঁহার মস্তক দ্বিখণ্ড হইয়া মণিকার কোলের কাছে ছিট্‌কাইয়া পড়িল। ওদিকে তখন প্রভাত; পর্ব্বতের পৃষ্ঠদেশ হইতে অকস্মাৎ সূর্য্যোদয় হইল—মণিকা দেখিল—পিতা!]

ম। পিতা! পিতা!—সূর্য্য তুমি ত সব দেখ্‌লে।

[মণিকা মৃত বাঁশুলিয়াকে বক্ষে তুলিয়া তিস্তার জলে নামিতে লাগিল।—ছুটিতে ছুটিতে অজিতের প্রবেশ—]

অ। পিতা! পিতা! মহারাজ! রাজকুমারী!

ম। (জলে নামিতে নামিতে) অজিৎ ভাই! ক্ষমা কর, আমি জীবন পণে প্রেম ক্রয় করেছি; ঐ দেখ তিস্তা আমাদের হাত বাড়িয়ে ডাক্‌ছে, বল্‌ছে বেশ করেছিস্।

অ। বেশ করেছ রাজকুমারী! আমিও জীবন দিয়ে সে প্রেম বিক্রয় কর্‌লাম, তাও তবে দেখে যাও—(অজিত নিজবক্ষে ছুরিকা বিদ্ধ করিলেন ও পড়িয়া গেলেন।)

ম। হিমালয়! হিমালয়! তোমার কন্যা! হিমালয় তুমি রইলে, যুগ যুগান্ত রইলে; এই কাজের সাক্ষী রইলে।

[মণিকা বাঁশুলিয়াকে বুকে লইয়া ডুবিয়া গেল—তিস্তার উপরে যে তুষার ভাসিতেছিল তাহা আবার সমান হইয়া গেল—চারিদিকে পাখীরা কলরব করিয়া উঠিল—] দূরে কৃষক রমণীরা গান গাইতে গাইতে মাঠের দিকে চলিয়াছে—

ভোরের বেলা পাখী গায়
সোনার আলো লুটায় পায়
ভুট্টা ক্ষেতে হাওয়া চলে
চল্‌লো কাজে চল্।
মনের মানুষ মনে আছে
ভাবনা কিসের বল্।

(যবনিকা পতন।)

শ্রীসত্যেন্দ্রকৃষ্ণ গুপ্ত।

অন্তর্যামী

(১)

ওই ছায়ালোকে ভাসে নিভৃত মন্দির!
অপূর্ব্ব আলোকভরা, অন্ধকারে ঢাকা;
শত লক্ষ চূড়া তার, আনন্দ গম্ভীর,
উঠেছে কোথায় যেন স্বপ্ন-পটে আঁকা!
নাহি বৃক্ষ, তবু আছে বৃক্ষেরি মতন
শত শত পল্লবের আড়াল করিয়া;
শত লক্ষ পুষ্পলতা অপূর্ব্ব বরণ,
পাকে পাকে উঠিতেছে ঘিরিয়া ঘিরিয়া!
উজ্জ্বল স্বপনভরা, আনন্দ গম্ভীর,
ওই ছায়ালোকে ভাসে অপূর্ব্ব মন্দির!

(২)

নাহি মেঘ তবু যেন ছুটাছুটি করে,
অপূর্ব্ব আলোক ছায়া, মেঘেরি মতন!
নাহি চন্দ্র, নাহি সূর্য্য! কি যে স্বপ্নভরে
উজলি রেখেছে তারে, সে কোন গগন!
নাহি শব্দ, তবু যেন নীরব গম্ভীর
উঠিতেছে নিরন্তর কার গীত ধার?
প্রশান্ত আনন্দভরা ধীর, অতি ধীর,
কে যেন বন্দনা করে কোন দেবতার!
বর্ণাতীত বর্ণে ঢাকা, আনন্দ গম্ভীর,
ওই ছায়ালোকে ভাসে নিভৃত মন্দির!

(৩)

ওই ছায়া-মন্দিরের কোথায় দুয়ার ?
কোন পথে যেতে হবে,
কে বল আমারে কবে,
যেন হেরি মনে মনে বদ্ধ চারিধার ?
ওই ছায়া-মন্দিরের কোথায় দুয়ার ?

কঠিন পাষাণে যেন রুদ্ধ চারিধার !
প্রবেশের পথ নাই,
যতই যাইতে চাই,
তবু আশা নাহি ছাড়ে অন্তর আমার !
ওই ছায়া-মন্দিরের কোথায় দুয়ার !

(৪)

যেতে হবে, যেতে হবে, যেতে হবে মোর !
আমার অন্তর-আত্মা বাসনা বিভোর,
উড়ে যেতে চায় ওই মন্দিরের পানে,
প্রাণ মোর ভরপুর কি কাতর গানে !
কেন হাসিতেছ তুমি, নির্ম্মম নিষ্ঠুর !
অজানিত পথ কিগো, এতই বন্ধুর ?
যেতে হবে, যেতে হবে, যেতে হবে মোর,
যেমন করেই হোক যেতে হবে মোর !
পথ খানি যেথা থাক, পাব আমি পাব,—
যেমন করেই হোক যাব, আমি যাব !

(৫)

পথ খানি লাগি প্রাণ ইতি উতি চায় ;
পথের না দেখা পেয়ে কাঁদে উভরায় !
কোথা পথ, কোথা পথ, কোথা পথ খানি !
সে পথ বিহনে যে গো, সব মিছা মানি !
এদিকে ওদিকে চাই, চকিত পরাণে,
পাগলের মত ধাই, পথের সন্ধানে !
এই পথ দেখি ভাবি, পেয়েছি পেয়েছি !
এ পথ সে পথ নয়, এ পথে এসেছি !
নিশ্বাস ফেলিয়া চলি, কত দূর জানি,
এই গ্রাম-প্রান্ত হ'তে সেই পথ খানি !

৫। বৌদ্ধ-ধর্ম্ম

২। কোথা হইতে আসিল ?

পূর্ব্বের "নারায়ণে" বৌদ্ধ-ধর্ম্ম কোথা হইতে আসিল তাহার কতকটা আভাস দিয়াছি। বঙ্গবগধচের জাতির আচার ব্যবহার ও ধর্ম্ম লইয়া বৌদ্ধ-ধর্ম্মের উৎপত্তি ঠিক হউক আর নাই হউক, বৌদ্ধ-ধর্ম্মের মতামত আচার-ব্যবহার অনেকটা পূর্ব্বদিক হইতেই আসিয়াছে। কিন্তু অনেকে জিজ্ঞাসা করিতে পারেন যে বঙ্গবগধচের জাতির কথা অল্প লোকেই জানে। অতি অল্পদিন হইল ঐতরেয় আরণ্যকের একটি ব্রাহ্মণে উহাদের নাম পাওয়া গিয়াছে। এখনও অনেক ইউরোপীয় পণ্ডিত বলিতেছেন ওখানটার অর্থবোধই হয় না। সায়ন বঙ্গবগধচের শব্দের অন্যরূপ অর্থ করিয়াছেন। তবে ওকথার উপর জোর দেওয়া যায় কি ? সায়নের কথা ধরি না ; সায়ন বেদরচনার দুই তিন হাজার বৎসর পরে উহার অর্থ করিতে বসিয়াছিলেন। দু'চারটা মানুষের নাম ও দেশের নামের তিনি যে অন্য অর্থ করিয়া দিবেন, ইহা বিচিত্র নহে। ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ এস্থলে তাঁহার অর্থ গ্রহণ করেন নাই এবং তাঁহারা নিজেও ইহার অর্থ কি স্থির নিশ্চয় করিতে পারেন নাই। কিন্তু আমরা ইহাতে বেশ দেখিতে পাইতেছি যে বঙ্গশব্দের মানেতে কোনও গোল নাই। সায়নের অর্থ বনংগতা, এ অর্থ আমরা লইতে পারি না। বগধ যে মগধ তাহাতেও আমাদের সন্দেহ হওয়া উচিত নহে। তামিল জাতির একটা শাখাকে যে চের বলিত তাহারও সন্দেহ নাই। এখনও দক্ষিণ দেশে তামিল বা দ্রাবিড়িয় জাতির মধ্যে কেরল নামে একটি প্রবল জাতি আছে। কেরলদিগের প্রাচীন নাম চের। চেরো বলিয়া একটি জাতিকে ছোটনাগপুরের সমস্ত

ঐতরেয় আরণ্যকে বঙ্গ বগধ ও চের জাতি।

জাতিই আপনাদের পূর্ব্বপুরুষ বলিয়া মনে করেন। কপিলবাস্তুর নিকটে এখনও যে থাড়ুজাতি আছে তাহারাও চেরো বা চেরজাতির একটা ধারা।

ঐতরেয় ব্রাহ্মণে ভরতের রাজত্ব।

এই সকলের সঙ্গে যদি আর একটা কথা ধরিয়া লওয়া যায়, তাহা হইলে আরও একটু সুবিধা হয়। সকলেই জানেন যে আরণ্যক-গুলি ব্রাহ্মণগুলিরই শেষ অংশ। ব্রাহ্মণ যে প্রকারের বই, আরণ্যকও সেই প্রকারেরই বই। ব্রাহ্মণে যাহা বলা হয় নাই, আরণ্যকে তাহাই বলা হইয়াছে। ঐতরেয় ব্রাহ্মণের শেষ অংশে ইন্দ্র-দেবতার মন্ত্রে অভিষেক হওয়ায় যেসকল রাজা বড় হইয়াছিলেন, বিশেষ অশ্বমেধ যাগ করিয়াছিলেন, তাহাদের একটি সুদীর্ঘ তালিকা আছে, যে ঋষি অভিষেকের পুরোহিত ছিলেন তাঁহার প্রশংসা আছে, আর যে রাজা অভিষেক লইয়াছিলেন তিনি কতবার অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়াছিলেন তাহারও উল্লেখ আছে। এই তালিকার শেষ ভাগে লেখা আছে যে ভরতরাজা ইন্দ্র অভিষেক লইয়া ১৩৩টা অশ্বমেধ করিয়াছিলেন। ইহার মধ্যে ৭৮টা যমুনার পশ্চিমে মরুক্ষ দেশে, আর ৫৫টা গঙ্গার পূর্ব্বে জলবৃষ্টির দেশে। যমুনার পশ্চিমে যতদূর যাইবে মরুদেশ আর উরু দেশ। কতদূর ভরতের অধিকার ছিল বলা যায় না। ৭৮ অশ্বমেধের জন্য কতখানি দেশ লওয়া আবশ্যক আমরা জানিনা। তবে এ পর্য্যন্ত বলিতে পারি যে বেলুচিস্তান উহার মধ্যে ছিল না। থাকিলে ভরতের নাম অনুসারে উহাও ভারতবর্ষ বলিয়া গণ্য হইত; তবেই যমুনার পশ্চিম হইতে সিন্ধুদেশের পশ্চিমসীমা পর্য্যন্ত ভূভাগ জয় করিয়া তিনি ৭৮টা অশ্বমেধ করিয়াছিলেন। তাই যদি হইল তবে ৫৫টা অশ্বমেধের জন্য গঙ্গার পূর্ব্বে কতটা জমী তাহাকে অধিকার করিতে হইয়াছিল? ঐতরেয় ব্রাহ্মণে অন্তর্বেদীর নাম একে-বারেই করে না, বলে যমুনার পশ্চিমে ও গঙ্গার পূর্ব্বে। এখন ৫৫ অশ্বমেধের জন্য কতটা দেশের দরকার। আমার বোধ হয়

এলাহাবাদ হইতে ঠিক উত্তরমুখে রেখা টানিলে ঐ রেখা ও গঙ্গার পূর্ব্বপারের মধ্যে যত দেশ পড়ে তাহাই ৫৫টা অশ্বমেধের পক্ষে যথেষ্ট।

ঐতরেয় ব্রাহ্মণে ভারতবর্ষ অথবা আর্য্যভূমির অথবা আর্য্যজাতির বসতি বিস্তারের এই সীমা নির্দ্ধারণ করিয়া দিলে, তাহার পরই

বঙ্গবগধ ও চেরগণ পাখী।

ঐতরেয় আরণ্যক বলিলেন যে বঙ্গ বগধ চের-জাতি পক্ষিবিশেষ; উহাদের ধর্ম্ম নাই, উহারা নরকগামী হইবে। ইহার মোটামোটি অর্থ এই হইল যে আর্য্যগণ এলাহাবাদ পর্য্যন্ত আসিয়াছিলেন, তাহার ওদিকেই বঙ্গবগধচেরজাতি। ইহারা আর্য্যগণের শত্রু। আর্য্যগণের বসতি-বিস্তারে বাধা দিতেন তাই আর্য্যগণ ইহাদিগকে দেখিতে পারিতেন না। যাহাদিগকে তাহারা দেখিতে পারিতেন না, তাহাদিগকে মানুষ না বলিয়া পশু পক্ষী রাক্ষস বলা তাঁহাদের রোগ ছিল। তামিল-গণ তাহাদের কাছে বানর। কর্ণাটগণ হয়ত ভালুক, লঙ্কার লোক রাক্ষস। সেইরূপ বাঙ্গালার লোক পাখী।

বুদ্ধদেব কিন্তু সেই পাখীর দেশেই জন্মান। তাঁহারও পূর্ব্বে কনকমুনি কপিলবাস্তুরই নিকটে জন্মাইয়া বোধি লাভ করেন। এই

বুদ্ধ পূর্ব্বাঞ্চলের লোক।

অঞ্চলেই জৈনধর্ম্ম-প্রচারক মহাবীর জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার জন্মস্থান বৈশালী, পাটনার উত্তর-পশ্চিম গঙ্গার উত্তরপারে। ইনি আবার জৈনযতি হইয়া বার বৎসর কাল পূর্ব্বাঞ্চলে ভ্রমণ করিয়া আসেন। বৈশালীর লোক মনে করিল, মহাবীর নিরুদ্দেশ হইয়াছেন। বার বৎসর পরে তিনি পূর্ণ জ্ঞান লাভ করিয়া কেবলী হইয়া ফিরিলেন। তাঁহারও পূর্ব্বে পার্শ্বনাথ কাশীতে জন্মগ্রহণ করিয়া সংসার পরি-ত্যাগের পর পূর্ব্ব অঞ্চলে নানাদেশ ভ্রমণ করিয়া সমেতগিরি অর্থাৎ পরেশনাথ পাহাড়ে বাস করিয়া তথায়ই দেহরক্ষা করেন। আর আর তীর্থঙ্করদের অনেকেই পূর্ব্ব অঞ্চলের লোক। ২৪জন বুদ্ধ

ও ২৪জন তীর্থঙ্করের বৃত্তান্ত পড়িলে একথা আরও প্রমাণ বলিয়া বোধ হইবে।

পশ্চিমাঞ্চলে যখন আর্য্যগণ যাগযজ্ঞ লইয়া ব্যস্ত, দেশ দখল করিতে ব্যস্ত, শ্রৌতসূত্র রচনায় ব্যস্ত, শূদ্রগণকে আয়ত্ত করিয়া তাহাদিগকে দাস করিয়া রাখার বন্দোবস্ত লইয়া ব্যস্ত, তখন পূর্ব্বাঞ্চলে বঙ্গবগধচেরগণ পরকাল লইয়া ব্যস্ত, কিসে জন্মজরামরণের হাত এড়ান যায় তাহাই লইয়া ব্যস্ত। পশ্চিমাঞ্চলে যেমন ঋষির পর ঋষি শ্রৌতসূত্র রচনা করিতে-ছিলেন; পূর্ব্ব অঞ্চলে তেমনি তীর্থঙ্করের পর তীর্থঙ্কর, বুদ্ধের পর বুদ্ধ পরকালে কিসে সুখে থাকা যায় তাহারই উপায় দেখিতেছিলেন।

পূর্ব্ব ও পশ্চিমে ভেদ।

শাক্যমুনি শেষ বুদ্ধ, মহাবীর শেষ তীর্থঙ্কর, দুজনেই এক সময়ের লোক। দুজনেই খৃষ্টের পূর্ব্বে ছয় শতের লোক। সুতরাং দীপ-ঙ্কর প্রভৃতি ২৪জন বুদ্ধ আর ঋষভদেবাদি ২৪জন তীর্থঙ্কর তাহাদের অনেক পূর্ব্বে আবি-র্ভূত হইয়াছিলেন। অনেকে বলেন যে শাক্যসিংহের পূর্ব্বে যে ২৩জন বুদ্ধ হইয়াছিলেন, তাঁহারা মানুষ নন—বৌদ্ধেরা আপনাদের ধর্ম্মটা পুরাণ, তাই দেখাইবার জন্যই ২৪টা নাম করিয়া রাখিয়াছে। কিন্তু শাক্যসিংহের পূর্ব্ববর্ত্তী কনকমুনির থাম্বা পাওয়া গিয়াছে, যেখানে তাহার নির্ব্বাণ লাভ হয় তাহা স্থির হইয়াছে; তাঁহাকে মানুষ নয় বলা এখন কঠিন হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এখনকার নেপালী বৌদ্ধেরা বলে চারিযুগে আটজন মানুষ বুদ্ধ। বিপশী ও শিখী সত্যযুগে, কাশ্যপ ও বিশ্বভূ ত্রেতাযুগে, ক্রকুচ্ছন্দ ও কনকমুনি দ্বাপরে, এবং শাক্যসিংহ ও মৈত্রেয় কলিযুগে। অপর ১৭জনকে তাঁহারা মানুষ বলুন আর নাই বলুন, শাক্যমুনি ও তাঁহার পূর্ব্বেকার ছয়জনকে তাহারা মানুষ বলেন। তীর্থঙ্করদের মধ্যেও, অনেকে মনে করেন যে শেষ দুইজন মাত্র সত্যসত্য মানুষ, বাকীগুলি মনগড়া মাত্র। তাহা হইলেও আমাদিগকে বুঝিতে হইবে যে, বুদ্ধ ও

২৪জন বুদ্ধ ও ২৪জন তীর্থঙ্কর।

মহাবীরের পূর্ব্ব হইতেই ভারতবর্ষের পূর্ব্বাঞ্চলে পরকাল লইয়া অনেক-দিন হইতে নাড়াচাড়া হইতেছিল।

বুদ্ধদেবের সময়ে ছয়টি ধর্ম্ম প্রচার হইয়াছিল, তাহাদের নাম যথা আজীবক—ইহা গোশালা মংখালি পুত্রের ধর্ম্ম, নিগ্রন্থ—ইহা মহাবীরের ধর্ম্ম, পূর্ণ কাশ্যপ একজন ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক, অজিতকেবশ কম্বল একজন, সঞ্জয় একজন ও পোকুদ কত্যায়ণ একজন।

এগুলিও ভারতবর্ষের পূর্ব্বাঞ্চলেই উৎপন্ন হইয়াছিল এবং সেই-খানেই ইহাদের শ্রীবৃদ্ধিও হইয়াছিল। ভারতবর্ষের পূর্ব্বাংশে লোক যে কেবল ধর্ম্ম লইয়াই থাকিত, এরূপ নহে; এখানে অন্যান্য বিষয়েও বিশেষ উন্নতি হইয়াছিল। ডাক্তার হরনলি বলেন যে অস্ত্রচিকিৎসা পূর্ব্বাঞ্চলেই আরম্ভ হইয়াছিল। হস্তিশাস্ত্র এই দেশেই রচনা হয়। ন্যায়-শাস্ত্র, অর্থশাস্ত্র, সাংখ্যশাস্ত্র, ইহাদের উৎপত্তিও পূর্ব্বভারতে; সুতরাং পূর্ব্বভারত যে এককালে একটি সুসভ্য দেশ ছিল, ইহা অনায়াসেই ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে। আর্য্যগণ যখন সেই সুসভ্য দেশ আক্রমণ করিয়া তাহার রাজ্য সমাজ আচার ব্যবহার রীতিনীতি সব ভাঙ্গিয়া তাহাদিগকে আর্য্য সভ্যতা দান করিবার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন, সেই সময়ে তাহাদের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মসম্প্রদায় উঠিতে লাগিল এবং সেই সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে অনেকে তাহাদের পূর্ব্বসমাজ, পূর্ব্ব-আচার ও পূর্ব্বব্যবহার বজায় রাখিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। তাই এত ধর্ম্ম হইল, শেষ সব ধর্ম্ম উঠিয়া গিয়া এক বৌদ্ধ-ধর্ম্মই পূর্ব্ব-ভারতে থাকিয়া পূর্ব্বভারতের অতীত গৌরবের সাক্ষী দিতে লাগিল।

পূর্ব্বাঞ্চলেই বহু ধর্ম্মের প্রসার।

বৌদ্ধদিগের অনেক আচারব্যবহার আর্য্যগণের মধ্যে নাই। বৌদ্ধেরা সব মাথা কামায়—কোথাও এক গাছি কেশ রাখে না। কিন্তু হিন্দুর পক্ষে মাথার মাঝখানে একটা শিখা রাখা নিতান্ত দরকার। একথা যে আমরাই বলিতেছি এমন নহে, যে সকল মুসলমানেরা

বৌদ্ধ ও আর্য্য আচার-ব্যবহার ভেদ।

প্রথম বেহার দখল করেন তাঁহাদেরও আশ্চর্য্য বোধ হইয়াছিল। তাঁহারা বৌদ্ধ বলিয়া একটা ধর্ম্ম আছে জানিতেন না। একটা বৌদ্ধ-বিহার জয় করিয়া তাহারা দেখিলেন সেখানে বহুসংখ্যক ব্রাহ্মণ রহিয়াছে তাহাদের সব মাথা কামান। সব মাথা কামান হিন্দুর হইতেই পারে না। তবে ইদানীং কোন কোন সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসী শিখাত্যাগ করিয়াছেন। ব্রাহ্মণের শিখাচ্ছেদের স্থায় অবমাননা আর নাই। সেইজন্য ধর্ম্মশাস্ত্রের ব্যবস্থা, ব্রাহ্মণ কোন গুরুতর দুষ্কর্ম্ম করিলে তাহাকে দেশ হইতে দূর করিয়া দিবে। তাহার সম্পত্তি তাহার সঙ্গে দিবে, কেবল তাহার শিখাটি ছেদন করিয়া লইবে। কিন্তু বৌদ্ধ-ধর্ম্মে সকলেরই শিখাচ্ছেদ করিতেই হইত।

মাথা কামান।

আহার বৌদ্ধেরা বারটার আগে করিবে। বারটার এক মিনিট পরে আহার করিতে পারিবেন না। আহার তাহাদের কিছুই অখাদ্য নহে। যদি তাহাদের আহারের উদ্দেশে মারা না হয়, অন্য কারণে কোনও জন্তু মারা হয়, তাহারা সে জন্তুর মাংস অনায়াসে খাইতে পারে। রাত্রে তাহারা রস খাইতে পারে, জল খাইতে পারে, কিন্তু শক্ত জিনিস খাইতে পারে না। তাহারা পেয় খাইতে পারে কিন্তু চর্ব্ব চোষ্য লেহ্য খাইতে পারে না। এই ত তাহাদের নিয়ম। এটি কিন্তু আর্য্য নিয়মের বিরোধী। আর্য্যগণ এক সূর্য্যে দুইবার খাইতেন না। সুতরাং দিনে একবার ও রাত্রে একবার। তাঁহাদের কল্যবর্ত্ত বা প্রাতরাশের কথা আমরা সর্ব্বদা শুনিতে পাই। একবার খাইয়া আর্য্যগণ চব্বিশ ঘণ্টা থাকিতে পারিতেন কিনা সন্দেহ। তাঁহাদের ক্ষুধা সতেজ ছিল।

আহারের নিয়ম।

বৌদ্ধ-ভিক্ষুগণ সোনা রূপা ছুঁইতে পারিতেন না। পূর্ব্বভারতে উহাদের ছোঁয়ার দরকার ছিল না। কারণ সোনা রূপার টাকা এদেশে অতি কমই ব্যবহার হইত। এদেশে কড়ির ব্যবহার অধিক ছিল, সোনা রূপা ব্যবহার না করিলেও চলিত।

স্বর্ণ রৌপ্য ত্যাগ।

বৌদ্ধ-ভিক্ষুগণ উচ্চাসন মহাসন ত্যাগ করিতেন। হিন্দুস্থানে পঞ্জাবে এমন কি ভারতবর্ষের সব দেশেই খাটিয়ার উপর শোয়। মাটিতে শুইতে তাহাদের বড়ই কষ্ট হয়, পারত-পক্ষে তাহারা মাটিতে শোয় না। কিন্তু বাঙ্গালায় তাহার বিপরীত। অধিকাংশ লোকই ভূমিতে শয্যা পাতিয়া শোয়। অবস্থাপন্ন ব্যক্তি হইলে খাট চৌকি তক্তাপোষ ব্যবহার করে।

উচ্চাসন মহাসন ত্যাগ।

বৌদ্ধমতে মদ খাওয়া একেবারে নিষেধ। গৃহস্থ যাহারা পঞ্চশীল মাত্র গ্রহণ করিবে তাহারাও মদ খাইতে পারিবে না, একথা আর্য্য-গণের পক্ষে খাটে না। তাঁহারা সোম পান করিতেন। সৌত্রামণিযাগে তাঁহারা সুরাপান করিতেন। পুরাণে বলে পূর্ব্বে সকলেই সুরাপান করিতেন, কিন্তু শুক্রাচার্য্য শাপ দেওয়ায়, মদ খাওয়া মহাপাতকের মধ্যে গণ্য হয়। কিন্তু বৈধ মদ্য সকল সময়েই চলিত, যথা পশুযাগে সোম, সৌত্রা-মণিতে সুরা।

মদ্য ত্যাগ।

এইরূপে দেখা যায় যে বৌদ্ধ-ধর্ম্ম ও আর্য্য-ধর্ম্মে অনেক কাজের কথায়ই প্রভেদ। তখন বৌদ্ধ-ধর্ম্ম কোথা হইতে আসিল বলিতে গেলে, আর্য্য-ধর্ম্ম হইতে আসিল একথা বলা যায় না, আর কোনও দিক হইতে আসিয়াছে। এত প্রাচীনকালে আর কোন্ দিক হইতে আসিবে সুতরাং পূর্ব্বদিক হইতেই আসিয়াছে। আচ্ছা যদি তাহাই হইল, তবে বুদ্ধদেব কি নূতন কথা বাহির করিয়াছেন? তাঁহার ধর্ম্মের স্থূল কথাগুলি, বিষয়গুলি যদি প্রাচীন ধর্ম্ম বা প্রাচীন সমাজ হইতে লওয়া, তবে তাঁহার নূতনত্ব কি? বুদ্ধদেবের পূর্ব্বেও লোকে সংসার ত্যাগ করিত, ভিক্ষু হইত; যেমন পার্শ্বনাথের দল, কনকমুনির দল। সংসার ত্যাগ করিয়া ভিক্ষু হইয়া থাকিতে গেলেই অহিংসা, অস্তেয় প্রভৃতি শীল গ্রহণ করিতে হয়, খাওয়া দাওয়া সম্বন্ধে খুব সাবধান হইতে হয়। প্রাচীন ভিক্ষুরাও তাহাই করিত। কিন্তু বুদ্ধদেব যে বিহার ও

সঙ্ঘারামের ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন, তাহা তাঁহার নিজের। ভিক্ষু-দিগের শাসনের জন্য যে সকল নিয়ম লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার নিজের। এক জায়গায় অনেক ভিক্ষু থাকার ব্যবস্থা তাঁহার নিজের। এইরূপ অনেকগুলি ভিক্ষু একত্র থাকিলে তাহাদের মধ্যে কোনওরূপ গোলযোগ যাহাতে না হয়, তাহার ব্যবস্থা তাঁহার নিজের। যে সকল সুন্দর সুন্দর গল্প করিয়া তিনি সাধারণের চিত্ত আকর্ষণ করিতেন, সেগুলি প্রাচীন ভারতে চলিত থাকিলেও, যে আকারে তাহা-দিগকে এখন দেখিতে পাওয়া যায় সে আকারটি তাঁহার দেওয়া। তিনি রাজার ছেলে, রাজা হইবার সবশিক্ষা তাঁহার হইয়াছিল। তিনি সংসার ত্যাগ করিয়াও রাজার প্রধান যে গুণ, দশজনকে লইয়া সুন্দররূপে কাজ চালান, তাহা ছাড়েন নাই। ভিক্ষুসঙ্ঘের পরম উন্নতির জন্য, তাঁহার যেসব রাজগুণ ছিল, সব প্রয়োগ করিয়াছেন। বাস্তবিকও তাঁহার সঙ্ঘ যেমন প্রবল হইয়াছিল এমন আর কাহারও হয় নাই। তিনি যে শুদ্ধ ভিক্ষুদের বন্দোবস্ত করিয়াই নিশ্চিন্ত ছিলেন তাহা নহে। তিনি গৃহস্থ বৌদ্ধদিগের জন্যও বেশ বন্দোবস্ত করিয়া গিয়া-ছেন। তাহাদের পঞ্চশীল ও অষ্টশীল দিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।

কিন্তু যাহাতে বুদ্ধের ধর্ম্ম এত বড়, যাহাতে বুদ্ধের নাম এত বড়, যাহার জন্য বুদ্ধের সংসারে এত সম্মান, যাহার জন্য সকল ধর্ম্ম অপেক্ষা তাঁহার ধর্ম্ম এত উদার, সেটি তাঁহার মধ্যমা প্রতিপৎ অর্থাৎ 'মাঝামাঝি চল, বাড়াবাড়ি করিও না।' তিনি নৈরঞ্জনার ধারে ছয় বৎসর তপস্যা করিয়া যে জ্ঞান প্রাপ্ত হন, যাহা পাইয়া তিনি আপ-নাকে জ্ঞানী বলিয়া প্রচার করেন, যে জ্ঞান পাওয়ায় ইন্দ্র ব্রহ্মা আসিয়া তাঁহাকে অভ্যর্থনা করেন, যাহা পাওয়ায় মার একেবারে হতাশ হইয়া পড়ে, সে এই মধ্যমা প্রতিপৎ। মাঝামাঝি চল। অহিংসা ধর্ম্ম পালন করিতে হইবে বলিয়া, একেবারে মুখে কাপড় বাঁধিয়া চল যেন কোন কীট মুখে না ঢুকিতে পারে। রাত্রে প্রদীপ জ্বালিও না, পাছে তাহাতে কীট পতঙ্গ পড়ে। মলত্যাগ করিয়া তাহা কাঠি দিয়া নাড়িয়া

দিও যেন পোকামাকড় তাহার মধ্যে শুকাইয়া না যায়। রাস্তায় চলিবার সময় এক গাছ ঝাঁটা হাতে করিয়া যাইও যেন তোমার পায়ের চাপনে কোন পোকা মাকড় মারা না যায়। এসকল বাড়াবাড়ি নয় কি ? বুদ্ধদেব এতদূর বাড়াবাড়ি করিতে বলেন না। তিনি বলেন ইচ্ছা করিয়া কোন জীবহত্যা করিও না। তাহা হইলেই অহিংসা ধর্ম্ম পালন হইবে। তিনি বলেন অত্যন্ত ভোগাসক্তি ভাল নয় ; কেবল ভাল খাব, ভাল পরব, তারি চেষ্টা করা, সেটা ভাল নয়, আবার ক্রমাগত উপবাস করিব, পঞ্চতপা করিব, চারিদিকে আগুন জ্বালিয়া সূর্য্যের দিকে চাহিয়া দিন কাটাইয়া দিব, ইহাও ভাল নয়। তিনি নিজে যথেষ্ট কঠোর ব্রত করিয়াছিলেন, যথেষ্ট উপবাস করিয়াছিলেন, কিন্তু শেষে বুঝিয়াছিলেন যে উহাতে কোনও লাভ নাই, শরীরের কষ্টই সার ; তখন তাঁহার জ্ঞান হইল যে এগুলা করা ভাল নয়। ভোগও করিবে না, কঠোরও করিবে না, তবে করিবে কি ? অশ্বঘোষ বুদ্ধের মুখে বলাইয়াছেন,—আহারঃ প্রাণযাত্রায়ৈ ন ভোগায় নদৃপ্তয়ে। এই যে মধ্যমা প্রতিপৎ এইটিই বৌদ্ধ-ধর্ম্মের মজ্জা, সার, নিগূঢ় কথা, উপনিষৎ। বুদ্ধদেব যতদিন জীবিত ছিলেন, সর্ব্ব বিষয়ে মধ্যমা প্রতিপৎ অবলম্বন করিয়াই চলিতেন, শিষ্যদিগকে শিখাইতেন। দুটা বিরোধী জিনিস উপস্থিত হইলে, সে দুটার বিরোধ মিটাইয়া দিতে তিনি সিদ্ধহস্ত ছিলেন।

শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী।

আরও কিছু আমার কথা

আনন্দে আনন্দময়! আনন্দকে পেয়ে আমার শোণিত-প্রবাহ, আজ উল্লাসে নৃত্য করছে, হৃৎপিণ্ড আমায় দোলা দিচ্ছে, পুলক আমার দেহ-তন্ত্রীকে ঝঙ্কৃত করছে। আমার হিয়ার ধগ্‌ধগিতে, আমি সে প্রাণবস্তুর পরিচয় পাচ্ছি। তারি ঐন্দ্রজালিক প্রভাবে আমার স্ফীতবক্ষের রক্তবিন্দুসকলের রঙ্ বদলে গেল। আমি শুভ্রতাকে পেয়ে আজ আমার "পয়োধরা" নাম সার্থক জান্‌লাম। আর মুগ্ধ নেত্রে চেয়ে দেখ্‌লাম, এই আনন্দধরিত্রীদের অঙ্গে, সেই শিল্পী কুশলীর এই ত শ্রেয়সী বিরচনা! আজ আমার মুখশ্রীতে এক অলৌকিক স্নিগ্ধ আভা দেখে, কে যেন অনিমেষ নয়নে আমায় নিরীক্ষণ কর্‌ছেন, আর আমি হ্রীবিজিতা মুগ্ধার মত ব্রীড়ানত হয়ে এক অপূর্ব্ব আত্মপ্রসাদ অনুভব করছি। আমি তাই আজ রূপের উপযাচিকা, পরশের পরিচারিকা, রসের নবনায়িকা। আজ যৌবন আমার হৃদ্‌বিহারী, গন্ধ আমার মনোহারী, শব্দ আমার ভাণ্ডারী, আর "আমি" হয়ে আছে আমার দুয়ারের ভিখারী, দূরে দাঁড়ায়ে অভিমান "মরিছে গুমরি!" আমি যে আনন্দে বিভোর হলাম। একি! অকস্মাৎ কেন আমি বধির হয়ে গেলাম, আর কানে কথা যায় না, কে আমায় অবশ করে দিলে, আর ছোঁওয়া গায়ে লাগ্‌ছে না, আমার যে চক্ষু গেল আর দেখ্‌তে পাচ্ছিনা। রস আস্বাদন আমার মিটে গেল। একি হোল! এ যে অশব্দ, অস্পর্শ, অরূপ, অগন্ধ, অরস। এই কি মৃত্যু। হে মরণশীল! তুমি ত আজ ভয়ঙ্কর নও, আমি ত তোমায় দেখে ভীত হচ্ছিনা। এতো তোমার সংহার মূর্ত্তি নয়! আজ বিনাশ করতে আসনি! আজ আমায় আলিঙ্গন দিয়ে, আমার আনন্দকে বাঁচাতে এসেছ? তাকে চিরজীবী কর্‌বে বলে? তুমিই অমৃতের সোপান! আজ স্পর্দ্ধা করে বল্‌তে পারব, মৃত্যুই আনন্দ,

আনন্দই মৃত্যু! দুইএর একই অমৃতস্বরূপ! "আনন্দরূপমমৃতম্, অমৃতরূপমানন্দম্।" আজ তুমি মৃত্যুরূপে মৃত্যুঞ্জয়ী নাম ধরেছ? আজ কেন এ কৃপা? এ কার কৃপা? এযে কৃপাহি কেবলম্।

পেলাম ত, ঘরে রাখ্‌তে পারব কি? এ ঘরে যে সাতভূতের কীর্ত্তন, কেউ এসে টিকে থাক্‌তে চায় না। আমার শৈশব এসেছিল, চলে গেছে। বাল্যকে আমি পেয়েছিলাম, ধরে রাখা গেলনা। কৈশোর, কৈ কিছুতেই ত রইল না। এখন যৌবন, সেও যাই যাই করছে। এ ঘরে আমার কোনই একতিয়ার নাই;—যদিও এ আমারি পৈত্রিক ভিটায়, আমারি মায়ের মালমসলায় তৈয়ারী, ন্যায্যমতে আমিই এর উত্তরাধিকারী। কিন্তু কে একে অমন বেওয়ারিসি মাল করে দিলে? যার যখন ইচ্ছা আসে যায়; এ'কে ভাঙ্গে গড়ে, গাঁথে, জোড়ে, সাজায় গোজায়; কের দেখ্ না দেখ্ চলে যায়। না করে এরা আমায় আস্‌তে জিজ্ঞাসা। না জানিয়ে যায় যাবার বেলা! আছি যেন একটা সাক্ষী গোপাল পড়ে। আমার ছিল একখানা খুদে ঘর, ছিলাম আমি তাতে গরীবী হালেতে। না তা হোলনা; কর, কর, একে বড় কর; কর, কর, একে মনোহর কর; সাজাও দিয়ে সৌখিন সাজ, দাও তাক্ লাগিয়ে সবায় আজ। তোমরা ত তাক্ লাগিয়ে দিয়ে খালাস্! তারপর, তাল সাম্‌লায় কে বল দেখি? দেখ, বাড়ী ঘর যতই বাড়ানো হবে, বাহার তার যতই খুলবে, ততই তাতে বাসের সুখও বিস্তর পাবে, বিড়ম্বনা ভোগও বহুতর জানবে। দেখ্‌ছ না কি যে এই ঐশ্বর্য্যের বিকারে এ ঘরের সকলের মাথা কেমন বিগ্‌ড়ে গেছে। আমার পাঁচ প্রভু ত থেকে থেকে, কেবলি বেকাঁস বক্‌ছে, বেহুদা হাস্‌ছে, বেয়াড়া তাকাচ্ছে, বেহুঁস চলেছে, বেয়াদবি কর্‌ছে। আমি কাকে থুয়ে কাকে সামলাই! কেমনেইবা সাম্‌লাই বল? আমার আপনার মাথায়ই কত কি যে খেয়াল চাপ্‌ছে! তা যদি বলি! আমার কখনও ইচ্ছা করছে নিদ্রার মত লোচনগ্রাহিণী হয়ে, মূর্চ্ছার মত মনোহারিণী রূপে সকল সংযমীর ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটাই। আবার কখনও

এক ভুজঙ্গিনী হয়ে, তাকে বেড়িয়ে বেড়িয়ে, তার সর্ব্বাঙ্গে বিষের জ্বালা ঢেলে দিয়ে, পরক্ষণে শত চুম্বনে তা তুলে নিয়ে, আপনি তা পান করে, প্রেমময়কে প্রেমে পাগল হ'তে শেখাই। আমার সাধ যায়, অপ্‌সরার ঢঙে, আকাশ থেকে নেমে, সজ্জনের ঘরে আগুন ছুঁইয়ে ত্বরিতে পালাই। আবার এও মনে লয়, যাদুকরীর বেশে এসে, পথের পান্থগুকে ধরে, হেসে আপন পাশে যাদু করে রাখি। খেয়ালের কথা বল কেন? কিন্তু তা বলে আসলে কি কিছু মিলে নাই? কার দৌলতে আমার "আমি"কে তাড়ায়ে, অভিমানকে এড়ায়ে, আমার দুর্লভ দেখা দিল? আমার দূরত্ব ঘুচে গেল, আমাতে আনন্দ সম্ভব হ'ল? আমি অসহায় না ত?

আমি অসহায়, এ'কে আঁকড়ে ধরেই ত প্রাণে বেঁচে আছি। তাই সদা ভয়, এই আসা যাওয়ায় আমার কিছু আসবে যাবে না ত? যৌবন! তুমি যে বড় টিপি টিপি হাসছ? তোমার মিয়াদী পাট্টা ফুরিয়ে এসেছে? তোমার মনস্কামনা সিদ্ধ হয়েছে? এবারে তল্পিতল্পা তুলবে? দোকান পাট ওঠাবে? তা হবে না, সেটি হতে দিচ্ছিনা। জোর জুলুমে না পারি, সাধ্য সাধনা করব, তাতে না কুলায় ত প্রসাধনা আরম্ভ করব। তুমি যাবে? হ'তেই পারে না। তুমি যে যৌবন! আমার তনুর তনিমা, বক্ষের গরিমা, নয়নের নীলিমা! তুমি যাবে? হে রহস্যময়! আমি যে তোমারি চাতুর্য্যে মোহিনী রমণী, তোমারি ঐশ্বর্য্যে গরবিণী গৃহিণী, তোমারি প্রসাদে সংবর্দ্ধিনী জননী। তুমি যাবে? তুমি যে আমার প্রিয়ের প্রথম অনুচর, আমার প্রেয়ের লীলা-সহচর, আমার নিত্য-মনোহর! তুমি যাবে? তুমি যে, হে সুন্দর! আমার স্পৃহণীয়, আমার স্মরণীয়, আমার ভজনীয়, তুমি যে "হয়ে জীবনের প্রভু, হাসাও কাঁদাও কভু।" আমার যে "ও রাঙ্গা চরণে তবু পরাণ লোটায়"। তুমি যাবে? তা যাবে বৈ কি? কে আমি রাখ্‌বার? কে আমি রাখ্‌বার? তা আমাদের কাছে থাকবে কেন? তখন তাদের বয়েস হয়ে আসে, তাতে তারা জাতে পুরুষ, সহজেই সাহস বেশী।

তারা জেনে শুনেই যৌবনে এসে পা দেয়, যৌবন সে পদস্পর্শে হেসে জেগে উঠে তাদের সেবায় লেগে যায়। আর যৌবনের যাবার নামটি নাই। আমাদের তখন যদিচ থাকে উচকা বয়েস, কিন্তু আমরা মায়ের জাত কিনা, মান রেখে চলাই আমাদের ধারার ধাত। আমরা সহজে গিয়ে কারো গায়ে পা ছোঁয়াতে পারিনা, আমাদের স্বভাবে তা দেয় না। যৌবন যেচেই আমাদের ঘরে আসে,—দেখে, আমরা তারে লাভ ক'রে সাদরে হৃদাসনে বসাই। তবুও এসেই তার যাই যাই যাই। ছুনিয়ার দস্তরই এই ? "শক্তের ভক্ত নরমের যম"। তা যে যাই বল ? যাই যাই করলে আর তাকে ধরে রাখা যায় না। সে কেমন উস্‌খুস্ করে, মনটা তার উড়ুউড়ু হয়ে যায়। কথা মিছে নয়, "ধরে বেঁধে প্রেম চলে না"। খোসামুদি ছাড়লাম, ডাকলাম এস এস আমার "আমি", এস এস আমার অভিমান তুমি! আর তোমা-দের কোণঠেসা করে রাখা কেন ? তা বৈকি ? এ বিলাস বিভব কে নেবে! আমার বিম্বাধরের স্থধা অফুরন্তই রবে। আমার বাহুপাশের অমৃতক্ষরণ নিঃশেষেই চল্‌বে। যাক্ না যৌবন যেতে চায় ত! ভয় কি ? ভাবনা কিসের ? শোণিতপ্রবাহ! তোমরা বেঁচে যাবে, আর দিবারাত্রি ত্বড়িত বেগে কারো হুকুমে ছুটাছুটী করতে হবে না। হৃদ্‌পিণ্ড! আর ত্রস্ত দোলা দিয়ে কেউ তোমায় হয়রাণ করে দিবে না। শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ,—এ বেলা তোমাদের মস্তিষ্কের বিকারের উপশম হবে। জানি তোমরা, ফের সমজে কথা কইবে, বুঝে কাছে বসবে, দেখে দৃষ্টি দেবে, ভেবে বশ করবে। যাক্‌না যৌবন যেতে চায় ত। কার ভয় ? কিসের ভাবনা ? মন! তুমি তবে আমার আনন্দকে এর হাত থেকে নিয়ে নেও, তবেই আমি আনন্দ-মনে বসে বসে এদের আসা যাওয়া দেখ্‌তে পারব। মুখের কথায় মন মান্‌ছে ত ?

যৌবন যখন দোটানায় পড়ে "নযযৌ, নতস্থৌ" তখন একটু যেন দিলাশা পেলাম। মনকে চোখ ঠার দিয়ে প্রসাধনায় লাগিয়ে দিলাম।

অপাঙ্গে অঞ্জন চাই? কেন? "আঁখিতে অঞ্জন নইলে কি আঁখি-রঞ্জন মিলে?" আমার দিব্য দৃষ্টি রোখ্‌বে না ত? "ক্ষেপা! পক্ষ্ম সকল প্রহরী আছে কি কর্‌তে, পলকেই সব সাম্‌লে নিবে যে।" ভালে সিন্দুর বিন্দু চাই? ওসব ছিটা ফোঁটায় কি কারো মন তোষা যায়? প্রিয়তম হাস্‌বেন যে, ছি! তখন লজ্জায় মুখ দেখাব কেমন করে? ইন্দুমুখি! লজ্জাজড় মুখটি দেখাবার এই ত ফন্দী। কপোলে পত্রলেখা? নয় ত চিত্রলেখে! বিগতপ্রায় রক্তিম আভা ফোটাবে কিসে? বক্ষে চন্দন? "বল্লভের সেই ত চিত্ত-বিনোদন।" চরণে অলক্ত রেখা? "বিলাস প্রিয়ের এই ত মনো-লোভা।" তাই ত অঙ্গে আমার আভরণের আভা ঝলসিছে। বুঝি বা আমার দিন ফিরিল। আমি আপন মনে বসে বসে আপ্‌না রূপ দেখ্‌ছি। এ মোহিনী মূরতি বটে, মনোমোহিনী ত নয়? এ বিচিত্র চিত্র নিশ্চয়, চৈতন্যস্বরূপ ত নয়। এ প্রতিমায় প্রাণ প্রতিষ্ঠা নাই, আমার কি স্তাবক মিল্‌বে না?

শব্দ! তুমি কারো বার্ত্ত শোনাবে না? পরশ দেখ্‌ছি গা আল্‌গা দিয়ে বসল! রূপের যেন চোখ বুজে আস্‌ছে, বলি রস! আর বশ করায় তোমার মতি নাই? গন্ধ! কেন আমোদ করা ছেড়েছিলে? কার কথা কে কয়? সব চুপ! আমি ত বুঝি না এ নীরব পরিহাস কেন? আমি কি তবে দিনের নাগাল পেয়ে দিনের মাথা খেলাম। আমি লজ্জা পেয়ে, সজ্জা ছাড়লাম, "এখন মরি যে লাজে!" চেয়ে দেখি চারিদিকে মৃতের আকার। তাই ত! আমি প্রাণী? অমৃতের সন্তান? মৃতের কেহ নই? তাই কি? আহা! তাই যেন হয়!

যৌবন এবারে যাবার যোগাড় দেখ্‌ল। জানান দিয়ে এর যাওয়া কেন? আর সকলের মত বল্‌ করে এর যাওয়া নয় কেন? বুঝিবা এই রয়ে সয়ে যাওয়ার কোন রহস্য থাক্‌বে? না! পারলাম না আর আমি, এই মাথাপাগ্‌লা কটাকে নিয়ে? এরা আমায় প্রাণান্ত না করে ছাড়্‌বে না দেখছি।

শব্দের চোট্, কে তার স্বরের মধুটুকু চুরি করেছে ; পরশের কথা, কে তার মোহ-পাত্র ভেঙ্গে ফেলেছে ; রূপের নালিশ, কে তার সুখদর্শনে বাদ সেধেছে। রসে এসে নাকি মেলা ভেজাল মেশাল পড়েছে। গন্ধের নাকি খাতির খতম হ'তে চল্‌ল। নালিশে আর সুপারিশে আমি একেবারে নাস্তানাবুদ হয়ে পড়লাম। ঘরে কি যেন এক লুণ্ঠন বিলুণ্ঠন ব্যাপার উপস্থিত। থাক্ সে শোনা কথা। নিজের চখে কি দেখ্‌ছি ? আমার অমন চারু চিক্কণ চেহারার সে চটক্ কৈ ? আমার নিখুঁত কপালে এ লেখা ছিল ? কৈ আগে ত তা দেখিনি ! এখন আর এ লেখার রেখা পোঁছা যাবে না ! আমার সেই ঢল ঢল কপোলে ওসব কিসের ছাপ ? আর এ ছাপ ঢাকা পড়্‌বে না ! দেখ দেখ, আমার কাল' মিশমিশে চুলের দশা দেখ। দেখে হেসে আর বাঁচিনা। সারাটা দেহ ছেয়েই এই সাদায় কালোয় অদল বদল চলেছে ? মন্দ না ! এ যে দেখ্‌ছি কলাবিদ্যা-সমন্বিত চৌর্য্য-বৃত্তি ! তুলি ধরে ধরে রঙে বেরঙ মিশিয়ে, স্থানে বেস্থানে আঁচর কেটে দিয়ে কারিগরি ফলানো হয়েছে। মতলব, মিষ্ট বস্তুটিকে মাটি করে দেওয়া। এ নষ্টামি বুদ্ধি কার ? কেন "আমি"র মুখটি এবারে চূণ কেন ? অভিমানের দোষ দিলে কি হবে ? সে মানী লোক, আপনা মান আপনার কাছে, সে ত তোমার মত সরফরাজি জানে না, করতে চায়ও না ; সে কিছু বেশ-কম দেখ্‌লে অন্তরে জ্বলে পুড়ে মর্‌লেও, কয়ে তা সে জানাবে না। ঐ পাঁচটাকে দেখাচ্ছ কি ? ওরা ত আগে থাকতেই চটে আগুন হয়েই ছিল ! রাগের মাথায় রাশব্দ না করাই মঙ্গল। কে জানে ! কি বল্‌তে কি বলে ফেল্‌বে, শেষ-কালে জবাবদিহি কে হবে, বাপু ?

সব সমান ! এতদিনে বুঝলাম, এদের উমেদারী করা কি ঝক্-মারী। অথচ এদের ছেড়েও আমাদের বাঁচোয়া নেই। একজনকে আমরা জন্মের দাবী পাওনা পেয়ে থাকি, আর এক জনকে জন্মের সঙ্গে ফাও দিয়ে দেয়, বাকী ক'জনা জন্মশোধ সাথী হয়ে আসে।

এসব কাণ্ড পাওনার ফেরে পড়ে, মাঝে থেকে আমরা ফাঁপর হয়ে মরি যে। এদের ত দেখি দম্ভই সার, কাজের বেলায় হয়ে যায় হতভম্ব। বসে বসে "কি গেল বল্লেই কি গেল? একি অরাজকের রাজ্য পড়েছে নাকি" বলে চেঁচামেচী করলে আর চোখ রাঙ্গালেই ত আর চোর ধরা পড়ে না, চুরি বন্ধ হয় না? খোঁজ নাও, খবর-দারী কর, তবে ত তোমাদের প্রভুগিরি মানব? মন তুমি মুসড়ে গেলে যে? আমাতে ভয় এল, আমাকে ভাবনায় ধর্‌ল। যৌবন ধীরে সুস্তে তার সঙ্গের সরঞ্জাম সব সম্বরতে সুরু কর্‌ল। আমার তাক্ লাগ্‌লো, ভবনে ভাঙ্গনি লাগল। কে, ও, আমার হাবেলীর সীমানা দিয়ে, হাল্‌কা পায়ে চলা-ফিরা করছে? যেন চিনি চিনি চিনিনা, জানি জানি জানিনা। কে তুমি? কার অত আস্‌কারা?

এবার কি তোমার প্রবেশের পালা? আরো কি ভাঙ্গবে? আরো কি গড়্‌বে? কে তুমি? দাঁড়াও, মুখ দেখ্‌তে চাই। মুখ দেখে, চমকে গেলাম! চোখ দেখে মনে হোল একে ভূতে পেয়েছে। আমারি ঘরের মানুষ, জন্মইস্তক আমারি সঙ্গে মানুষ হয়ে, আজ তার এ বেইমানি বুদ্ধি? বিশ্বাস হ'ল না? কেও তলব করেছে নিশ্চয়। নয় ত, আমি ভোলা মন দেখে, আপনার খাতা খুলে সব আমার খবরাখবর টুকে রেখে দিয়েছিল, দরকার মত আমায় স্মরণ করিয়ে দিবে বলে। কত খাতির, কত স্নেহ! যেন সোদরের মত। তার আজ এ দুর্মতি! আমারি খেয়ে পরে, আমারি ঘরে সিঁদ কাটবে? কেমনে প্রত্যয় যাই বল? বল বল তুমি বল, কার হুকুমে একাজে লাগ্‌লে? কি! তুমি মরণের কিঙ্কর? এঘরে আসবার বেলা, দাসখৎ লিখে দিয়ে, কবুল করে এসেছিলে, চুরির মাল তাকে দিবে বলে? কৈফিয়ৎ দিতে হলে এই লেখা দেখাবে? তাই নিকাশের খাতাপত্তর সঙ্গেই এনেছিলে, আর লিখে লিখে রাখ্‌তে? কার মনে কি থাকে বুঝে ওঠা ভার! হে কিতব! তোমার মনে এই ছিল! হে বয়শ্চোর! এবারে কিছু

নিয়ে নিয়েছ। যা, না নিতে পেরেছ, নাশ করে গেছ; বাকী সব ছতরছান করে আমার ভিটায় আগুন ধরিয়ে দিয়ে সট্‌কাবে? তখন মরণ এসে আমায় ভস্ম করে আমায় মরণ দেখাবে?

ওহে ক্রীতদাস! তুমি চাকরীর চক্রান্তে পড়ে, চোখের মাথা খেয়ে, প্রভুর বিভূতি মূর্ত্তি দেখ বলে, আমারে দেখাচ্ছ মৃত্যুর ভয়? হে তস্কর! কি বুঝিবে তুমি, মৃত্যু আমার কে? আমার চিতা পুড়ে ছাই ভস্ম হয়ে গেলে, তাতে গঙ্গাজল ঢাল্‌লে, আমি মরা, সে জল-স্পর্শে, মরণেরি মহামন্ত্র-বলে, ভস্মস্তূপ ঠেলে অমর হয়ে উঠে দাঁড়াব। তুমি অজ্ঞান, তুমি কিঙ্কর! কি জানিবে তুমি মৃত্যুর মহিমা? আমি যে তাই বিনাশেরি পথে গিয়ে বহুকাল ধরে মরণেরি শরণ লয়েছি। হে বড় চোর! কর কর তুমি চুরি কর, যত পার, আমি আজ হতে আর তোমায় কিছু বল্‌ব না।

মুখে বল্লাম বটে! কিন্তু চোখে দেখ্‌ছি ঐ ঘরের ভাঙ্গনি, চোখে দেখ্‌ছি ঐ চোর! চোখে দেখ্‌ছি ঐ চিতার আগুন! ঐ ভস্ম হয়ে ছাই হয়ে যাওয়া। আতঙ্ক! আতঙ্ক! আনন্দ আমার গোল্লায় গেল। এ দৈব দুর্দ্দিনে, দুঃখের দিনে, প্রিয়তম পরশ আমার এক ভরসা। কিন্তু হে আমার পরশমণি! আমায় ছুঁয়ে ছুঁয়ে জ্ঞানহারা করে দিওনা, আমি যে তা হোলে, তোমার ডাক শুনতে পাব না। ও মধুমাখা ডাক না শুনলে আমি চক্ষে অন্ধকার দেখি। হে সুন্দর! হে আমার অতি সুন্দর! তা হলে এ চোখ নিয়ে আর কি করব? আমি যে চাই, সব দেখা চুকিয়ে দিয়ে, জন্মভরে এক দেখা দেখ্‌ব! আর মুখভরে বল্‌ব "জনম অবধি হাম রূপ নেহারিনু নয়ন না তিরোপিত ভেল"। আমি যে চাই সব ছোঁওয়ার বালাই নিয়ে, এক ছোঁওয়ায় মিশিয়ে দিয়ে, বল্‌তে, "লাখ লাখ যুগ হিয়া পর রাখনু তবু হিয়া পুড়ন না গেল।" তাই বল্‌ছিলাম হে আমার সর্ব্বস্বহর! আমার জ্ঞান কেড়ে নিওনা। তবেই আমার সব যাবে, আমার সর্ব্বনাশ হবে। তবু শুনছ না?

পলে পলে আমায় অবশ করে, অসার করে, আমায় কালা করে, আমায় কাণা করে দিচ্ছ? গাঢ় গাঢ়তর আলিঙ্গন? আমার যে শ্বাস বন্ধ হয়ে এল? নিবিড় নিপীড়ন? ভয় খেয়ে গেছ্‌লাম? কৈ জ্বালাত বোধ কর্‌ছিনা, আমার সবই ত রইল, সর্ব্বনাশ ত হলনা? তুমি কি গায়ে মধু ঢেলে এসেছ? তুমি অমৃতের অধিকারী? এ মধুরসে মধুপরশে আমি যে ক্রমে মধু হয়ে যাচ্ছি। আস্তে আস্তে আমার অস্তিত্ব লোপ পেয়ে গেল! আর আমায় খুঁজে পাচ্ছিনা। আমি শুধু আমার ছিলাম, এখন মধুর হলাম; সঙ্গে আমার আর সবও মধুর হয়ে গেল! এখন আমার শব্দ মধুর হয়ে গেল, আমার পরশ মধুর হয়ে গেল, আমার রূপ মধুর, আমার রস মধুর, আমার গন্ধ মধুর। হে মধুকর! এই জগৎ মধুর করে দিলে? মধু, মধু, মধু! মধুময় হেরি এ ত্রিভুবন! আজ অঙ্গ দেখাচ্ছে সব মধুর চাক ঐ অঙ্গীকে; অঙ্গী দেখাচ্ছে সব মধুর চাক ঐ অঙ্গকে; আর আমি অঙ্গাঙ্গী, এই দুই মধুর চাক হ'তে, জনম জনম মধু "পিও, পিও জিওন রহব।"

শ্রীজগদম্বা দেবী।

———

সেকালের স্মৃতি।—বাজে কথা

৩। বঙ্কিমচন্দ্র।

১২৯৮ সালের কথা বলিতেছি। মুন্নী আমাকে অক্সফোর্ড হইতে লিখিলেন, আমরা বঙ্কিমবাবুর বহিগুলির ইংরাজী অনুবাদ করিয়া ছাপিতে চাই। তুমি অনুমতি লইবার চেষ্টা কর।

তখন অক্সফোর্ডে একটি সাহিত্য-সভা ছিল। মুন্নী প্রভৃতি সেই সভায় যোগ দিয়াছিলেন। ইংরেজ ছাত্রেরা তাঁহাদের দেশের ও ইউরোপের প্রতিভাশালী গ্রন্থকারদের রচনা পড়িয়া শুনাইতেন। বাঙ্গালী ছাত্রেরা তাঁহাদের দেশের কবি ও ঔপন্যাসিকদিগের রচনার অনুবাদ করিয়া বিদেশী সভ্যদিগকে তৃপ্ত করিতেন। চণ্ডীদাস, গোবিন্দ-দাস, বিদ্যাপতি প্রভৃতির কবিতা ও বঙ্কিমচন্দ্রের কয়েকখানি উপ-ন্যাসের অনুবাদ শুনিয়া বিদেশী ছাত্রেরা মুগ্ধ হইয়াছিলেন। তাঁহারা বাঙ্গালী সতীর্থদিগকে বলিয়াছিলেন, তোমাদের দেশের প্রতিভাশালী গ্রন্থকারদিগের রচনা ইংরেজী ভাষায় অনুবাদ করিয়া ছাপাও না কেন? আমাদের ভাষায় সকল দেশের বড় বড় কবি ও লেখকদের রচনার অনুবাদ হয়। কিন্তু তোমাদের দেশের সাহিত্যের পরিচয় নাই। এই সভা হইতে, অন্ততঃ সভ্যদের ব্যবহারের জন্য, কিছু কিছু ছাপাইবার ব্যবস্থা কর।

তাই মুন্নী আমাকে বঙ্কিমবাবুর অনুমতিলাভের চেষ্টা করিতে লিখিয়াছিলেন। আমিও উৎসাহিত হইয়া, পর দিন প্রভাতে বঙ্কিম-বাবুর বাড়ীতে যাত্রা করিলাম।

বঙ্কিমবাবু দ্বিতলে, উত্তরের ঘরে বসিয়াছিলেন। এই ঘরটিই তাঁহার study ছিল। বঙ্কিমবাবু তামাক খাইতেছিলেন। সেদিন

তাঁহাকে বেশ প্রসন্ন দেখিয়া আমি তাঁহাকে মুন্নীর চিঠির কথা বলিলাম।

অক্সফোর্ডের—মোক্ষমূলরের উক্ষতোরণের মনীষী ও সাহিত্যরসিক ছাত্রসম্প্রদায় অনুবাদে বঙ্কিমবাবুর উপন্যাসের আস্বাদ পাইয়া ছাপাইবার অনুরোধ করিয়াছিলেন, ইহাতে আমারা একটু গর্ব্ব অনুভব করিয়াছিলাম। জাতির গৌরব মনে করিয়া প্রফুল্ল হইয়াছিলাম। মনে করিয়াছিলাম, শুনিয়া বঙ্কিমবাবুও আনন্দিত হইবেন। কিন্তু বঙ্কিমবাবুর কোনও ভাবান্তর দেখিলাম না। তিনি আনন্দ প্রকাশ করিলেন না, সম্মতিও দিলেন না! আমি অত্যন্ত নিরুৎসাহ হইয়া বলিলাম, "কেন?"

বঙ্কিমবাবু গড়িয়ার কাঠের নলটি মুখ হইতে নামাইয়া স্মিতমুখে বলিলেন, "না।"

আমি বলিলাম, "মুন্নীরা আশা করিয়া লিখিয়াছে। তাহারা দুঃখিত হইবে;—হয় ত বিদেশী সহপাঠীদিগের কাছে অপ্রস্তুত হইবে। ইহাতে আপনার ক্ষতি কি?"

বঙ্কিমবাবু বলিলেন, "আমি অনেক ভাবিয়া দেখিয়াছি। একবার মনে করিয়াছিলাম, আমার বহিগুলির ইংরাজী করিয়া ছাপাইব। পরে স্থির করিয়াছি, না ছাপাই ভাল।"

আমি বিস্মিত হইয়া বলিলাম, "কেন?"

বঙ্কিমবাবু বলিলেন, "রমেশ তখন বিলাতে ছিলেন। আমি তাঁহাকে বিলাতের Publisherদের সঙ্গে পরামর্শ করিতে লিখিয়াছিলাম। উত্তরে রমেশ লিখিলেন, বিলাতের Publisherরা নিজের খরচে বাঙ্গালা উপন্যাসের অনুবাদ ছাপিতে চায় না। বিলাতে এখন problem লইয়া উপন্যাস লিখিবার হুজুক চলিতেছে। লোকে তাই পড়ে ও তাই কেনে। এ সময়ে অন্য উপন্যাস ছাপিলে লাভ হইবে না। রমেশের সঙ্গে এ সম্বন্ধে আমার চিঠিপত্র চলিয়াছিল।"

রমেশ—স্বর্গীয় রমেশচন্দ্র দত্ত। বঙ্কিমবাবুর সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠতা

ছিল। রমেশবাবুকে অনেকবার বঙ্কিমবাবুর বাড়ীতে দেখিয়াছি। উভয়ে মশগুল হইয়া নানা বিষয়ের আলোচনা করিতেন।

আমি বলিলাম,—"মুন্সীরা নিজের খরচে ছাপিবে। আপনি যে রকম বন্দোবস্ত করিতে বলিবেন, আমি সেই রকম করিতে লিখিব।"

বঙ্কিমবাবু একটু হাসিয়া স্নেহপূর্ণস্বরে বলিলেন, "তোমার যে বড় আগ্রহ! তুমিও দুঃখিত হইতেছ। কিন্তু আগে সব শোন। শুধু লাভ-লোকসানের কথা নয়। আমি মনে করিয়াছিলাম, নিজেই ছাপিব। তোমাকে বলি,—আমার দুই একখানা উপন্যাসের ইংরাজী অনুবাদ হইয়াছে। তাহা আমার পছন্দ হয় নাই। আমি নিজে অনুবাদ করিব, ঠিক করিয়াছিলাম। আমার শেষের উপন্যাস কয়-খানা যে উদ্দেশ্যে লিখিয়াছিলাম, সেই উদ্দেশ্যের জন্যই উহাদের অনুবাদ করিব—ভাবিয়াছিলাম। এই দেখ,—"

বঙ্কিমবাবু চেয়ার হইতে উঠিলেন; ঘরের পশ্চিম দিকে একটি আলমারীর দিকে অগ্রসর হইলেন; আলমারী খুলিয়া সকলকার উপরের তাক হইতে একখানি বড় বাঁধানো খাতা বাহির করিয়া আমাকে দিলেন।

আমি দেখিলাম, দেবী চৌধুরাণীর অনুবাদ!

বঙ্কিমবাবু বলিলেন, "দেখ, কত খাটিয়াছি। অনুবাদ করিয়াছি। কাটিয়া কুটিয়া আবার 'ফেয়ার' করিয়াছি। তাহার পর বাঁধাইয়া তুলিয়া রাখিয়াছি।—"

আমি সাগ্রহে বলিলাম, "তবে এইখানিই দিন।"

বঙ্কিমবাবু বলিলেন, "না; আমি বিলাতী Publisher-দের কাছ থেকে estimate পর্য্যন্ত আনাইয়াছিলাম। শেষে ভাবিয়া দেখিলাম, ছাপাইয়া কোনও লাভ নাই। ইংরেজরা আমার উপন্যাস বুঝিতে পারিবে না।"

আমি বলিলাম, "সে কি? অক্সফোর্ডের শিক্ষিত ছাত্রদের ভাল লাগিল, ইংরেজ পাঠকের ভাল লাগিবে না?"

বঙ্কিমবাবু মৃদু মৃদু হাসিতে হাসিতে মাথা নাড়িতে লাগিলেন, আমার হাত হইতে দেবী চৌধুরাণীর পাণ্ডুলিপির খাতাখানি লইয়া পাতা উল্টাইয়া দেখিতে লাগিলেন। বঙ্কিমবাবু একবার খাতা হইতে মুখ তুলিয়া আমার দিকে চাহিলেন; আমি অমনই সুযোগ পাইয়া, মিনতি করিয়া, আব্দার করিয়া বলিলাম, "একবার পরখ করিয়া দেখিলে হয় না—ভাল লাগে কি না?—তাহারা কি বলে?"

বঙ্কিমবাবু বলিলেন, "শুধু তাহাদের ভাল লাগিবে না—নয়; তাহারা গালাগালি দিবে।"

আমি বিস্মিত হইয়া বলিলাম, "গালাগালি দিবে?"

বঙ্কিমবাবু বলিলেন, "হাঁ। এই দেবীর কথাই ধর। আমি খুব ভাবিয়া চিন্তিয়া দেখিয়াছি। এই ব্রজেশ্বরের বিয়ের কথা কি উহারা বুঝিতে পারিবে? polygamy বলিয়া চীৎকার করিবে। আমি কেন ব্রজেশ্বরের তিনটি বিবাহ দিয়াছি, তাহার উদ্দেশ্য কি, তাহা বিলাতের লোক বুঝিবে না। তোমাদের দেশেও ত 'বহুবিবাহ' দেখিয়াই কেহ কেহ শিহরিয়া উঠিয়াছে।"

আমি তবু নিরস্ত হইলাম না; সাহস করিয়া বলিলাম, "তাহা ত পুস্তকের ভূমিকায় বুঝাইয়া দিলে হয়।"

বঙ্কিমবাবু বলিলেন, "তোমাদের আব্দার রাখিতে পারিলে আমি খুসী হইতাম। কিন্তু আমি এখন ইংরেজীতে আমার বই বাহির করিব না। তোমাদের অনুরোধ রাখিতে পারিলাম না—কিছু মনে করিও না।"

আমি নিরাশ হইয়া ফিরিলাম, এবং মুন্নীকে বঙ্কিমবাবুর প্রত্যাখ্যানের কথা লিখিয়া দিলাম। Private circulationএর জন্য ছাপিবারও বঙ্কিমবাবু অনুমতি দিলেন না।

দুঃখের বিষয় এই যে, বঙ্কিমবাবুর কৃত "দেবী চৌধুরাণী"র অনুবাদ হারাইয়া গিয়াছে। আমি বঙ্কিমবাবুর দ্বিতীয় দৌহিত্র, স্নেহভাজন

শ্রীমান পূরেন্দুসুন্দরকে দেবীর অনুবাদ ছাপিতে বলি। তিনি পাণ্ডু-লিপি খুঁজিয়া পান নাই।

গ্রন্থকারের নিজের অনুবাদটি নষ্ট না হইলে, তাহা ভবিষ্যৎ অনু-বাদকদিগকে পথনির্দ্দেশ করিতে পারিত।

সাহিত্যের প্রাণ স্বদেশী। তাহাতে সার্ব্বভৌমিক ভাবও থাকে। তবু এক দেশের সাহিত্য অন্য দেশের আদর্শ হইতে পারে না। বঙ্কিমবাবু আমার মত নাবালকের নিকট তাঁহার আপত্তির সমস্ত কারণ নির্দ্দেশ করেন নাই। একটা স্থূল দৃষ্টান্ত দিয়া আমাকে নিরস্ত করিয়াছিলেন। এ সম্বন্ধে আর কাহারও সহিত তাঁহার কথা হইয়াছিল কি না, বলিতে পারি না। বঙ্কিমবাবু বলিয়াছিলেন, "এখন ইংরেজীতে আমার বই বাহির করিব না।" তিনি কি অনুকূল সময়ের প্রতীক্ষা করিতেছিলেন? তাঁহার সমস্ত উপন্যাস ত উদ্দেশ্যমূলক নয়। সেগুলির অনুবাদ করিবার অনুমতি দিলেন না কেন?

এখন একটা কথা মনে হইতেছে। বঙ্কিমবাবু খাঁটী 'স্বদেশী' ছিলেন। তিনিই প্রথম বাঙ্গালীকে 'স্বদেশ' দেখাইয়া ও চিনাইয়া দিয়াছিলেন। স্বদেশের জন্যই লিখিতেন। শেষ জীবনে নিষ্কাম ধর্ম্মের ও নিষ্কাম কর্ম্মের প্রচারক হইয়াছিলেন। তাঁহার সাহিত্যসেবাও নিষ্কাম ও উদ্দেশ্যমূলক ছিল। সে উদ্দেশ্য প্রধানতঃ দেশমধ্যেই আবদ্ধ ছিল। যাহা দেশের বস্তু, দেশে সার্থক হইবার হয়—হউক, ইহাই হয় ত তাঁহার কামনা ছিল।

* * * * * * *

ইহার অনেক দিন পরে বঙ্কিমবাবুকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, "আপনি কি আর উপন্যাস লিখিবেন না? আমরা কি পড়িব?"

বঙ্কিমবাবু যেন আমাদের পড়িবার জন্যই উপন্যাস লিখিতেন! বঙ্কিমবাবু এ ধৃষ্টতাটুকু ক্ষমা করিয়া বলিয়াছিলেন, "তা ঠিক বলিতে পারি না। তবে অনেক দিন থেকে একটা জিনিস লিখিবার ইচ্ছা

আছে। হইয়া উঠিতেছে না। বৈদিক যুগের ছবি দিয়া একখানা উপন্যাস লিখিব। তবে—হইয়া উঠিবে কি না, বলিতে পারি না।"

বঙ্কিমবাবু অনেক দিন বৈদিক সাহিত্যের আলোচনা করিয়াছিলেন; বেদের দেবতা, ধর্ম্ম প্রভৃতি সম্বন্ধে প্রবন্ধও লিখিয়াছিলেন। সেই সময়েই বোধ হয় এই সঙ্কল্পের উদয় হইয়াছিল। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্যক্রমে তাহা 'হইয়া উঠিবার' পূর্ব্বেই বঙ্কিমবাবু ইহলোক ত্যাগ করিলেন।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "আপনি কি আরম্ভ করিয়াছেন?"

বঙ্কিমবাবু বলিলেন, "না; আরম্ভ করিতে পারিলে শেষ হইয়া যায়।—যদি লিখিয়া উঠিতে পারি, এবং তোমাদের ভাল লাগে, তা হ'লে, ইংরেজী করে' ছাপান যাবে। কি বল?"

আমার সেই আগ্রহের কথা তখনও বঙ্কিমবাবুর মনে ছিল! আমি একটু অপ্রতিভ হইয়া চুপ করিয়া রহিলাম।

* * * * * * *

১২৯৯ সালে বাঙ্গালা দেশে সমুদ্র-যাত্রার আন্দোলন আরব্ধ হইল। স্বর্গীয় রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুর এই আন্দোলনের নেতা ছিলেন। উভয় পক্ষের আগ্রহ ক্রমে বিরোধের সন্নিহিত হইল। বিচার ক্রমে বিতণ্ডায় পরিণত হইল। বিতর্ক ক্রমে চরমে উঠিল। সংবাদপত্রে বাঁদরামী দেখা দিল।

স্বর্গীয় শ্যামলাল মিত্র বিদ্যাসাগরের বন্ধু ছিলেন। তিনি সংস্কারের পক্ষপাতী; সমুদ্র-যাত্রার সমর্থন করিতেন। এই সময়ে "জন্মভূমি"তে সমুদ্র-যাত্রার বিরুদ্ধে একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। শ্যামলাল বাবু সেই প্রবন্ধের প্রতিবাদ করিয়া একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। ১২৯৯ সালের আষাঢ় মাসের "সাহিত্যে" ঐ প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়।

তাহার পর, "সাহিত্যে"র এক জন পৃষ্ঠপোষক, আমার অগ্রজতুল্য,

প্রতিষ্ঠাশালী সুলেখক সমুদ্র-যাত্রার বিরোধীদিগকে ব্যঙ্গ করিয়া একটি প্রবন্ধ লেখেন; এবং "সাহিত্যে" ছাপাইবার জন্য পাঠাইয়া দেন।

প্রবন্ধটি পাইয়া, আনন্দিত হইয়াছিলাম, কিন্তু পড়িয়া গোলে পড়িলাম। আমাদের "সাহিত্য" তখন প্রায় গণতন্ত্র ছিল। এখন গণও নাই, তন্ত্রও নাই; জনও ত খুঁজিয়া পাই না।—যাক, এখন গণের কথাই বলি। এই রচনার লেখক সমুদ্র-যাত্রার বিরোধীদিগকে 'বানর' বলিয়া গালি দিয়াছিলেন। আমি বলিলাম, "প্রবন্ধটি ছাপিয়া কাজ নাই।"

গণের কেহ কেহ আমার সমর্থন করিলেন; কিন্তু অনেকেই ছাপিতে বলিলেন। যিনি লিখিয়াছিলেন, তাঁহার লেখাই তখন "সাহিত্যে"র প্রধান অবলম্বন ছিল। তাঁহার লেখা না ছাপা সুবুদ্ধির কাজ নয়, তাহাও শুনিলাম। কিন্তু সকলেই স্বীকার করিলেন, প্রবন্ধটির শ্লেষ বিদ্রূপ খুব smart হয় নাই। কিন্তু এক জন—হায়! তিনি আর ইহলোকে নাই—স্বর্গীয় নলিনীকান্ত মুখোপাধ্যায় বলিলেন, "রচনা বেশ হইয়াছে। তুমি appreciate করিতে পারিতেছ না।" নলিনীর মতে আমার শ্রদ্ধা ছিল।—অমন স্নেহময়, প্রেমময় বন্ধু আর পাইব না। অমন সুখে সুখী, দুঃখে দুঃখী, ব্যথার ব্যথী, অভিন্নহৃদয় বন্ধু আমার ভাগ্যে আর ঘটে নাই। সাহিত্যই তাহার জীবনের সম্বল ছিল। কাব্য ও কবিতা ও কলাসৌন্দর্য্যে নলিনী মগ্ন হইয়া থাকিত। সংসারের দারিদ্র্য, দুঃখ, আবিলতা, কঠোরতা তাহাকে স্পর্শ করিতে পারিত না। নলিনীকে আমরা 'কবি' বলিয়া উপহাস করিতাম। নলিনী টুর্গেনেফ্, টলষ্টয়, হায়েন প্রভৃতির নিষ্ঠাবান ভক্ত ছিল। চৈতন্য-লাইব্রেরীতে সে যখন এই সকল গ্রন্থকারের কেতাবের আমদানী করে, তখন অনেকের পক্ষে সে সকল প্রহেলিকা ছিল। শান্ত, নম্র, ধীর, সারস্বত,—সংসারের কুটিল চক্রে অনভিজ্ঞ নলিনী জীবনের শেষদিন পর্য্যন্ত কৈশোরের সরলতা অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারিয়াছিল।

"দারিদ্র্যের মৃদু গর্ব্বে চরিত্র সুন্দর!" নলিনীর পক্ষে অম্বর্থ বলিয়া মনে হইত। নলিনীর জীবন বলিত—